ওঁতম্

আর্য জ্যোতি

বাংলাদেশ অগ্নিবীর ত্রৈমাসিক অনলাইন পত্রিকা

জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫ । সংখ্যা- ১০

২০৮১ বিক্রমাব্দ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (মাঘ-চৈত্র)

আর্ষ জ্যোতি

১০ম সংখ্যা

বাংলাদেশ সংস্কৃতীর

সূচিপত্র

ক্রমিক - বিষয় - পৃষ্ঠা সংখ্যা

১.বর্তমান যুগে বেদের কী দরকার ?- ১

২. পুরাণের ৩৩ কোটি দেবতা ৩৩ প্রকার নয় বরং ৩৩ কোটিই - ৭

৩. বেদে স্বামী স্ত্রীর প্রেম - ১২

৪. কলিযুগে কি মানুষ বেদ অনুযায়ী চলতে পারবে ? - ১৩

৫. বিভেদের সাতকাহন - ২১

৬. উপাসনার আগে প্রাণায়াম কেন করা হয় ? - ২৬

৭. সোমনাথ মন্দিরে কি আসলেই কোন মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিলো?- ২৮

৮. মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের দৃষ্টিতে বংশমর্যাদার মাপকাঠি - ৩০

৯. বৈদিক সরস্বতী- ব্রহ্মতত্ত্ব [বসন্তপঞ্চমী পালনপদ্ধতিসহ] - ৩৪

১০. গঙ্গা-যমুনায় স্নান করলেই কি সব পাপ মুছে যায় ?- ৩৯

১১. রাধা রাণীর সত্য উন্মোচন - ৪১

১২. ব্যভিচার-বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী - ৫৩

১৩. বিয়ে কি ৭ জন্মের বন্ধন ? যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তাঁর সাথেই কি অগ্নিসাক্ষী করে করা বিয়ে পরের জন্মেও থাকবে ? - ৫৬

১৪. বৈদিক শাস্ত্রে মৃতদেহ দাহের উল্লেখ আছে নাকি সমাধির ? - ৫৯

১৫. মহর্ষিস্তবঃ - অষ্টকম্ - ৬৩

১৬. বিধবাবন্ধু ~ আর্যসমাজ দ্বারা প্রকাশিত বিধবাবিবাহের একমাত্র সমর্থক পত্রিকা - ৬৪

১৭. যখন একজন ইংরেজ অফিসার মহর্ষি দয়ানন্দ জীর বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন - ৬৫

১৮. মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন এবং কার্যের প্রমুখ বিশেষতা - ৬৭

১৯. ঋগ্বেদ ১০।৮৬।১৩-১৪ রহস্য ~ পশুবলি নাকি বৈদিক অধ্যাত্ম ও জ্যোতিষবিজ্ঞান ? - ৬৮

২০. পাণ্ডবদের জন্মের রহস্য- ৭২

২১. ধৃতরাষ্ট্র - দ্রৌপদীর প্রকৃত জন্মকথা - ৭৬

২২. মহর্ষি দয়ানন্দের 'সংস্কৃত-বাক্য-প্রবোধ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত বিশটি সিদ্ধান্তরত্নাবলী -৮৮

২৩. তপস্যা কী ? - ৮৯

২৪. গীতায় অষ্টাঙ্গযোগ - ৯১

২৫. নিজের দোষের সমাধান না করে পালটা অন্যের দোষ বের করাকে কী বলে? - ৯২

২৬. আমরা কি ঈশ্বরের হাতের পুতুল ? তিনি যা করান তাই করি ? - ৯৩

২৭. কারো মৃত্যু হলে সেই বাড়িতে কি পূজা-পাঠ বন্ধ রাখা উচিত ? - ৯৫

২৮. মহর্ষি দয়ানন্দ এবং নারী শিক্ষায় তাঁর চিন্তাধারা - ৯৬

২৯. ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এদের মধ্যে কে বড় কে ছোট ? - ১০০
৩০. অগ্নিহোত্রে ২টি আজ্যভাগাহুতি দেওয়ার মাহাত্ম্য কী ? কী ফল পাওয়া যায় ? - ১০৩
৩১. বৈদিক নিয়মে বিবাহ সংস্কার- কী? কেন? কীভাবে? - ১০৪
৩২. যজ্ঞেই সনাতন ধর্ম অবস্থিত - যজ্ঞ করেন তো ? - ১০৮
৩৩.রান্না করা কি কেবল মেয়েদের শেখার বিষয় ? - ১০৯
৩৪. বাবা-মাকে ত্যাগ করে আমার শিষ্য হয়ো না - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী -১০৯
৩৫.পণ্ডিত লেখরামের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি - ১০৯
৩৬. 'রাষ্ট্রপতি' শব্দটি মহাভারতের সময় থেকেই প্রচলিত - ১১০
৩৭. বিকর্ণ - আর্যতীর্থ - ১১১
৩৮. "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সাংখ্য দর্শনের ১।৯২ সূত্রে কি ঈশ্বরের অনস্তিত্বতা প্রতিপাদন করা হয়েছে? - ১১২

বর্তমান যুগে বেদের কী দরকার ?

বর্তমান যুগে বহুধা বিভক্তি সমাজের জন্য বেদের গুরুত্ব অনেক । বেদ "বাগবিবৃতাশ্চ বেদাঃ" অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের বাণী । পরমাত্মা মানব মাত্রের "যথেমাং বাচং কল্যানীমাবদানিজনেভ্যঃ" কল্যাণের নিমিত্তে বেদ জ্ঞান প্রদান করেছেন । বেদ হলো এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার । এ এমনই এক অশেষ ধনসম্পদের আকর যেখানে যা আছে তা তো পাওয়া যায় ই , যা নেই তাও পাওয়া যায় । কথাটির তাৎপর্য হলো এই যে , বেদে বিজ্ঞান , সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি , ধর্মনীতি , অর্থনীতি , আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক , আধিভৌতিক মানবজীবনের সকল আচার-আচরণ সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা তো পাওয়া যায় বটেই পাশাপাশি বেদে বিভিন্ন মত- মতান্তরের ব্যক্তি নিজ নিজ মতের প্রবর্তকদের ও খুঁজে পায় । অথচ বেদ চর্চা থেকে দূরে থাকার কারণে কিংবা বেদাদি শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকার দরুণ আমার বিপথে চলে গিয়েছি ।

সময়ের বিবর্তনে, অজ্ঞানতার করালগ্রাসে, ঔপনিবেশিকদের চক্রান্তে , তথাকথিত ধর্মপ্রচারক তথা ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আজ মহান বেদের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছি । ফলস্বরূপ আমরা আজ জাতি হিসেবে এক ক্রান্তিলগ্নে দাড়িয়ে । জ্ঞানের অভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে অপমানের স্বীকার তো হতেহচ্ছে বটেই , এবং নিজেদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনেও অজ্ঞতার গ্লানিবয়ে নিয়ে চলেছি নিরন্তর । আমরাতো সংকীর্ণতা দ্বারা প্রতিহত , জটিলতা দ্বারা উদ্ভ্রান্ত , খণ্ডতা দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হয়ে আছি । বেদচর্চার অনুপস্থিতিতে দলে দলে পৌরাণিক জাতপাত , কুসংস্কারের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সনাতনী যার দরুণ আমাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি হিংসা , বিদ্বেষ , ক্ষোভ , ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে , নানা গুরু বা নানা নিজ দাবিকৃত তথাকথিত অবতার এসেছেন , যাদের কেন্দ্র করে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে । এই সম্প্রদায়গুলোর বেশিরভাগ নিজ গুরুর প্রতি অন্ধবিশ্বাসের জন্য গুরুকেই ঈশ্বর মেনে থাকেন । নিজ গুরুকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন এবং শাস্ত্রের বদলে গুরুর নির্দেশিত মতকেই গ্রহণ করেন । এসব গুরুদের অনেকেই আবার সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী । এভাবেই সনাতনী সমাজ ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে । একেক গুরুর একেক মন্ত্র , একেক ঈশ্বর তত্ত্ব , একেক প্রথা ও সংস্কার দেখে ২% দীক্ষিত বাদে বাকি ৯৮% সাধারণ সনাতনী নিজ ধর্ম নিয়ে চরম বিভ্রান্ত । কোন উৎসব পালন করবে ? কী খাবে ? পশুবলি কি বিহিত নাকি অবিহিত ? বর্ণ জন্মগত না কর্মগত ? কাকে ও কীভাবে উপাসনা করবে ? ঈশ্বর–জীব–প্রকৃতি তত্ত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক ? কোন মন্ত্র জপ করবে সবাই ? এসব সাধারণ ব্যাপারেই তারা বিভ্রান্ত ও একক সিদ্ধান্তহীন । অথচ এসবই আমাদের তথা যে কোন ধর্মীয় সমাজের মূল ভিত্তি । যারা কিনা এসব

ভিত্তিতে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দিয়ে এড়িয়ে যায় বা সবই ঠিক বলে তারাই মূলত বিভ্রান্তকারী শাস্ত্রব্যবসায়ী । যারা ঐক্যের কথা বলে তারা এটাই ভুলে যায় যে যদি মূলটাই ভিন্ন হয় তবে আপাত মধুর ঐক্যের রব কেবল শুনতেই ভালো লাগবে কিন্তু তা কখনোই বাস্তবে ফলপ্রসূ নয় । যদি দশজন সনাতনীকে ডেকে ঈশ্বরের নাম জিজ্ঞেস করা যায় , কেউ হয়তো বলবে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর , শিব তার দাস । কেউ বলবে শিব ঈশ্বর কৃষ্ণ শিবের ভক্ত । কেউ বলবে মা দূর্গা বা শক্তিই ঈশ্বর , বিষ্ণু , শিব এরা সবাই মায়ের সৃষ্টি কেউ আবার নিজস্ব মতবাদের গুরুদের নাম বলবে ঈশ্বর হিসেবে ।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ । আধুনিক এই যুগে এসে অনেক জ্ঞানপাপী সনাতনী নিজেরদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে বিচ্যুত তাদের উক্তি হলো এইরকম যে , বিজ্ঞানের যুগে বেদ অচল । কিন্তু বেদ যে সকল বিদ্যার ভাণ্ডার সেটা সম্পর্কে তারা অবগত নয় । অথচ বেদে নানাবিধ সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে বরং এই যুগে বেদের বেশি আবশ্যকতা রয়েছে । বেদ পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো -

সৃষ্টি উৎপত্তি সম্পর্কিত বিদ্যা , পৃথিবী , চন্দ্র , সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহ তথা মহাবিশ্ব সংক্রান্ত । পৃথিবীর আকার । জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত বিদ্যা , নৌ- বিমানাদি বিদ্যা । সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ , স্পেস ডাইমেনসন । সৌরশক্তি দ্বারা যান ও যন্ত্র চালানো । মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ বল আলোক বিদ্যা । বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় । পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ক । বস্তুকনা রক্ত সংবহনতন্ত্র , সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন , গনিত বিদ্যা , জলচক্র , ভ্রূণবিদ্যা , কঙ্কালতন্ত্র লিঙ্গ নির্ধারন , সমাজবিজ্ঞান রাজনীতি , অর্থনীতি , পরিবেশবাদ , দেশ , রাষ্ট সমাজ সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞান , জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত । ফিজিকাল , মেটাফিজিকাল এবং স্পিরিচুয়াল ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া , চিকিৎসা বিদ্যা ।
এছাড়াও নৈতিকতা যুদ্ধ বিদ্যা , সঙ্গীত বিদ্যা থেকে পার্থিব অপার্থিব আধ্যাত্মিক , আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল কিছু বেদ থেকে জানা যাবে । নিজের আত্মতত্ত্বকে জানে যাবে , শরীরকে সুস্থ রাখা । নিজের আচার-আচরণ ব্যবহার কর্তব্য-অকর্তব্য । পরিবার , সমাজ , রাষ্ট , দেশ , পৃথিবী ইত্যাদি

আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতে বেদ চর্চার অনুপস্থিতিতে বৈদিক সংস্কৃতি , সভ্যতা , রীতি-নীতি , পরম্পরা আদি লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে । এর বিপরীত কেবল ভোগবাদী এবং অর্থবাদী অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার পরম্পরার

অত্যধিক প্রচার এবং প্রসার হচ্ছে । শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত কে প্রধান্য না দিয়ে গুরুবাদ এবং কোনো ব্যক্তির মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যার ফলস্বরূপ ধর্মান্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে ।

যেমন নারীদের "ভোগ্য বস্তু" হিসেবে দেখা হয় অথচ বেদে নারীদের পবিত্রকারি , বিদুষী ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা হয়েছে ।

১. অঘ্ন্যা (যজু০ ৮ ।৪৩) = আঘাত না করার যোগ্য ।

২. অজুর্যা (ঋ০ ২।৩।৫) = রোগ রহিত ।

৩. অদিতি: (যজু০ ৮।৪৩) = অসীম ক্ষমতাবান ।

৪. অরণ্যানী (ঋ০১০।১৪৬।১) = সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্ত ।

৫. অশ্বসূনৃতা (সা০পূ০ ১৭৪১) = প্রিয় শব্দকারী ।

৬. ইডা (যজু০ ৮।৪৩) = প্রশংসনীয় গুণযুক্ত ।

৭. ইন্দ্রাণী ইত্যাদি (অথর্ব০ ৭ । ৪৯ । ২) = ঐশ্বর্যশালী

৮.রাকা (অথর্ব০ ৭।৪৮ । ১) = পৌর্ণমাসীর [পূর্ণিমা] ন্যায় শোভায়মান ।

৯. রাত্রিঃ (ঋ০ ১০ । ১২৭ । ১) = রাত্রির ন্যায় শান্তিপ্রদাত্রী নারী ।

১০.অশ্বাজনী (যজু০ ২৯।৫০)= অশ্বের প্রশিক্ষক নারী ।

ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে । বেদে নারীর অবস্থান অত্যন্ত গৌরবান্বিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । বেদে নারীকে এভাবে দেখানো হয়েছে যে সে দেবী , বিদুষী , প্রকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ , সে বীরাঙ্গনা , বীরের জননী , আদর্শ মাতা , কর্তব্যনিষ্ঠ , ধর্মপত্নি , সদ্গৃহিনী সম্রাজ্ঞী । সন্তানের প্রথম শিক্ষকা তিনি । অধ্যাপিকা হয়ে তিনি কণ্যাদের সদাচার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদি দান করেন । উপদেষ্টা হয়ে সকলকে সঠিক পথ দেখান ।

কত সুন্দর এই পৃথিবী! ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল-সুবিধা সমেত এই পৃথিবী উপহার দিয়েছেন প্রাণীকূলের বসবাসের জন্য । বায়ু , জল, মাটি ইত্যাদি সকল কিছুই আমাদের জীবনে গুরুত্ব বহন করে । কিন্তু আমরা এতটাই অধম যে যতদিনে এসবের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করি ততদিনে হয়তো সবই শেষ হওয়ার পথে । বৃক্ষ নিধন তথা বনাঞ্চল উজার , নদী-নালা দূষণ , মাটিতে পলিথিনের মতো অপচনশীল দ্রব্যাদি নিক্ষেপ , অধিক পরিমাণে গ্রীণ হাউজ গ্যাস উদগীরণ ইত্যাদি খামখেয়ালিপনার কারণেই নানারকম রোগ-ব্যাধি , প্রাকৃতিক বিপর্যয় , মানবিক বিপর্যয় , করোনা ভাইরাসের মতো প্রাণঘাতী ভাইরাসরা বারবার আমাদের আঘাত করছে । বৈদিক যুগে কিন্তু অবস্থা এমন ছিলো না । আমরা জানি পবিত্র বেদ সংসারের পূর্ণাঙ্গ বিধান আর তাই পরিবেশ রক্ষার

বিধানাবলীও বর্ণিত হয়েছে পবিত্র বেদে । সেই কালে সকলে পবিত্র বেদ অনুসরণ করতো ও নিয়মিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতো , পবিত্র বেদের নির্দেশ সবাই মেনে চলতো ।

ওঽম্ মাপো মৌষধীর্হিংসীর্ধাম্নো ধাম্নো রাজঁস্ততো বরুন নো মুঞ্চ । যদাহুরঘ্ন্যাSইয়ি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ । সুমিত্রিয়া নSআপSওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৌ সন্তু যৌSস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥

যজুর্বেদ ৬।২২

ভাবার্থঃ হে প্রজাগণের প্রতিপালক , জলকে কখনও দূষিত করো না , বৃক্ষ এবং বনভূমি কখনও ধ্বংস করো না । পানীয় এবং পুষ্টিবর্ধক উপাদানসমূহ সর্বদা সর্বত্র সহজলভ্য হোক । হে ন্যায়ের প্রতিপালক! পানীয় , বৃক্ষ ও বনভূমি এবং গাভীসমূহ পবিত্র । তাহাদেরকে নষ্ট করো না । তোমার অনুগ্রহে পানীয় এবং বৃক্ষসমূহ আমাদের মিত্রের ন্যায় সুখদায়ক হোক । কিন্তু যারা আমাদের উপর আঘাত হানে এবং আমাদের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে সেইসকল শত্রুদের নিকট বৃক্ষ এবং জল শত্রুবৎ প্রকটিত হোক ।

কাকংবীরমদ্বৃহ বনস্পতিমশস্তীর্বি হি নীনশঃ। মোত সূরো অহ এবা চন গ্রীবা আদধতে বেঃ।। ঋগ্বেদ ৬।৪৮।১৭

অনুবাদ- হে পুরবাসী! তোমরা জ্ঞানবান । বৃক্ষ উৎপাটন করোনা- তারা বিভিন্ন পক্ষীকে আশ্রয় দান করে । হ্যাঁ , নিশ্চিতভাবে তোমরা অপকারী এবং মনুষ্য সমাজে অপ্রয়োজনীয় ঝাড় এবং আগাছা থেকে মুক্তি পেতে পারো এবং উপরন্তু , পক্ষীদের শিকার ও হত্যা করো না । বৃক্ষের মতই তারা আমাদের টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ !

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অঙ্গীকারবদ্ধ হই যেন আমরা পরিবেশ রক্ষার্থে এগিয়ে আসি , পবিত্র বেদের নির্দেশ মেনে চলি কারণ পরিবেশ বাঁচলেই বাঁচবে মানুষ ,

বাঁচবে এই পৃথিবী ।

দ্যাং মা লেখীরন্তরিক্ষং মা হিংসীঃ পৃথিব্যা সম্ভব ॥ অয়ং হি ত্বা স্বধিতিস্তেতিজানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায়। অতস্ত্বং দেব বনস্পতে শতবলশো বিরোহ সহস্রবলশা বি বয়ং রূহেম॥

যজু ৫। ৪৩

পদার্থঃ হে মনুষ্য ! তুমি (দ্যাম্) দ্যুলোক কে (মা লেখিঃ১) বিকৃত করো না , (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ কে (মা লেখিঃ) বিকৃত করো না । (পৃথিব্যা সম্ভব) পৃথিবীর সাথে উত্তম পরিবেশে বাস করো । (অয়ম্ হি তেতিজানঃ স্বধিতিঃ) এই তীক্ষ্ণ কুঠার (মহতে সৌভাগায়) মহান সৌভাগ্যের জন্য । (ত্বা প্রণিনায়) তোমাকে অনুপ্রাণিত করছে (অতঃ) তাই (দেব বনস্পতে) হে হরিৎ বনস্পতি [বৃক্ষরাজি] ! (ত্বাম্) আপনি (শতবলশঃ) শিকড় অঙ্কুরে যুক্ত হয়ে (বিরোহ) বৃদ্ধি পান । (বয়ম) আমরা (সহস্রবলশা) সহস্র অঙ্কুরের ন্যায় (বিরুহেম) বৃদ্ধি পাই ।

বেদের আদেশ হলো , মানুষের উচিত শুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়া , শুদ্ধ জল পান করা , শুদ্ধ অন্ন ভোজন করা , শুদ্ধ মাটিতে খেলা , শুদ্ধ জমিতে চাষাবাদ করা । তবেই বেদ অনুসারে তার আয়ু একশ বছর বা একশো বছরের বেশি হবে । কিন্তু আজ শুধু আমাদের দেশেই নয় , বিদেশেও দূষণ এতটাই বেড়ে গেছে যে , শুদ্ধ বাতাস বা শুদ্ধ মাটি ও শুদ্ধ ভূমি মানুষের কাছে দুর্লভ । কলকারখানা থেকে নির্গত অপদ্রব্য যুক্ত ধোঁয়া , গ্যাস, আবর্জনা , বন-জঙ্গল উজাড় করা ইত্যাদি এই পরিবেশ দূষণের কারণ । পরিবেশ দূষণ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে অনেক জায়গায় অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে । কলকারখানার গ্যাস , ধোঁয়া, ড্রেনে প্রবাহিত অম্লীয় পদার্থ ইত্যাদি বায়ুমণ্ডলে মিশে আকাশে যতদূর পর্যন্ত ছড়ায় , ততদূর পর্যন্ত তাদের দ্বারা বায়ুদূষণ হয়েছে । পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি পরিবেশকে দূষিত করছে । যদি মানুষ বেদের বাণীর প্রতি মনোযোগ না দেয় , তবে একদিন ধ্বংস নিশ্চিত । আকাশে বহমান বাতাস , বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি , বজ্রপাত , যে ঘূর্ণিঝড় উঠবে , উল্কাবৃষ্টি , সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আসবে , সবই হবে বিষাক্ত । মানুষের নিঃশ্বাসও তখন তার মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাবে । কিন্তু বেদ মন্ত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করছে যে, হে মানব! পৃথিবীকে বিকৃত করো না , অন্তরিক্ষ-বায়ুকে বিকৃত করো না । হে মানব ! তুমি বৃক্ষকে বড় করো এবং তুমি নিজেও বড় হও । তোমার , বংশ , সম্পদ , বীরত্ব , বিজয়ের বৃদ্ধি হোক । বেদ আমাদের মানবতা এবং ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয় , একে অপরের সঙ্গে তথা সকল প্রাণীর প্রতি মিত্র ভাব রাখার শিক্ষা দেয় , সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দেয় , একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার শিক্ষা দেয় , অহিংসার শিক্ষা দেয় , **“বসুধৈব কুটুম্বকম”** আমরা এক জাতি , এক পরিবার ও এক মানবতার ধর্মের শিক্ষা দেয় । **“যুযোধ্যস্মদ্ দ্বেষাংসি”** [ঋগ্বেদ-২.৬.৮] হে পরমেশ্বর ! আমাদের হৃদয় থেকে ঈর্ষা , দ্বেষ , বৈরী ভাবকে দূর করো ।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ ।

দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥

ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২

বঙ্গানুবাদঃ— হে মনুষ্য ! তোমরা একসঙ্গে চল , একসঙ্গে মিলে আলোচনা কর , তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক । পূর্ব্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছেন তোমরাও সেই রূপ করো ।

বেদ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক , বিজ্ঞানী , লেখক ধর্মতত্ত্ববিদগণ বলেছেন -

"বেদ হচ্ছে শল্যবিদ্যা , শারীরবিদ্যা , প্রকৌশল , গণিত , সঙ্গীত , সংস্কৃতি সকল কিছুর মিলিত এক সমাবেশ , যেন এক জীবন্ত বিশ্বকোষ ! "

উইলিয়াম জেমস বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক ।

আশ্চর্য! বুঝতে পারলাম যে, যত ঐশ্বরিক গ্রন্থের কথা শোনা যায় তাদের মধ্যে বেদই একমাত্র যার সকল ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, একমাত্র এটিই জগতের ক্রমান্বয় উন্নতির পথ ঘোষণা করে। "

বিখ্যাত ফরাসি লেখক ও ধর্মতত্ত্ববিদ

Louis Jacolliot তার " Tha bible in

India" গ্রন্থে বলেছেন ।

যখন আমি বেদ পড়ি তখন এক অপ্রাকৃত আলোক যেন আমায় আলোকিত করে ,

এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো বিভেদ নেই ,

এটি সকল দেশ , সকল জাতি , সকল কালের জন্য।, যেন জ্ঞান অর্জনের এক রাজকীয় পথ ।"

হেনরী ডেভিড থরো

Vedas are the most rewarding and the most elevating book which can be possible in the World "

Arthur Schopenhauer

এই পর্যন্ত বেদ এত যত্নের সাথে সংরক্ষিত হয়েছে যে আর কোন বইয়ের সাথেই তার তুলনা দেয়া যায় না , এরকম পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষীণতম সম্ভাবণা পর্যন্ত না থাকা মানব ইতিহাসের একমাত্র দৃষ্টান্ত । "

আর্থার এন্থনি ম্যাকডোনেল

বর্তমান যুগে বেদের প্রয়োজনীয়তা

১) একটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের ষোড়শ সংস্কার পবিত্র বেদে আছে ।

২) হিন্দুরা গো-হত্যা করে না ? কোথায় আছে ? আছে পবিত্র বেদে ।

৩) হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে । কবর দেয় না । এটা কই আছে ? আছে পবিত্র বেদে ।

৪) একজন হিন্দু দিনে কয়বার ঈশ্বরের উপাসনা করবে । কোন কোন মন্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরের উপাসনা করবে তা সবই বেদেই আছে ।

৫) অন্নগ্রহণের পূর্বে , শয়নের পূর্বে ইত্যাদি কাজ ও বিভিন্ন শুভকর্মে কি মন্ত্র পাঠ করবেন তা সবই বেদেই আছে ।

৬) যখন কোন মুসলিম প্রশ্ন করবে সনাতনধর্মে নারী অধিকার বিষয়ে কি বলা আছে ? যেই বিষয়ে শত শত বেদমন্ত্র আছে বেদে ।

৬) আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সেই সনাতনধর্ম কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ? আধুনিক যুগের যুবসমাজ যখন এই প্রশ্নগুলো করবে তখন পবিত্র বেদে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে শত শত বিস্ময়কর তথ্য আছে ।

৭) সতিদাহপ্রথা , বাল্যবিবাহ , জাতিভেদ , বহুবিবাহ।, নারীশিক্ষা ইত্যাদি হিন্দুসমাজে বর্তমান ও পূর্ববিদ্যমান কুসংস্কারের সমাধান একমাত্র বেদ থেকেই যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভব ।

৮) দেশ সমাজ রাষ্ট্র চালানোর প্রেরণা নিয়ম কানুন বেদ থেকে পাই । এক কথায় আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু বেদ থেকে প্রেরণা পাই

বেদ শুধু আদি নয় । বেদ প্রধান , পরম , সর্বোচ্চ , শ্রেষ্ঠ ও মূল । বেদের অনুপস্থিতিই কোটি কোটি হিন্দুকে কনভার্টেড হইয়েছে যা অন্য কোনো গ্রন্থ বা কেউই রুখতে পারেনি । যে বাঙালী হিন্দুর কথা বলছেন তার প্রায় ৬০ ভাগ ই আজ কনভার্টেড । তাই বর্তমান সময়ে বেদের পঠন-পাঠন প্রচার প্রসার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । পরমেশ্বর আমাদের বেদ বাণীর দান করেছে সমগ্রবিশ্বের জন্য , সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য , বিশেষ কোন জাতি বা ধর্মের জন্য নয় । বেদপাঠে সবার অধিকার রয়েছে । তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ , আপনারা সত্যের পথে ধাবিত হন । বেদ অধ্যায়ন করুন , কুসংস্কার থেকে সমাজকে রক্ষা করুন ।

পুরাণের ৩৩ কোটি দেবতা ৩৩ প্রকার নয় বরং ৩৩ কোটিই

■ সম্প্রতি পৌরাণিক মতালম্বীদের মধ্যে পুরাণ কথিত ৩৩ কোটি [Crore] দেবদেবীকে বৈদিক ৩৩ টি দেবতার সাথে সম্পৃক্ত করে ভ্রান্তিময় প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে। তারা বিস্মৃত হয়েছেন পুরাণে ৩৩ কোটি বলতে ৩৩০ মিলিয়নকেই বোঝায়। বেদে ৩৩টি যে দেবতা হলো - "অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়ত্রিংশাবিতি" [বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।৯।২] অর্থাৎ অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এই কয়জন মিলে একত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলে তেত্রিশ দেব।

★ অষ্ট বসুঃ [অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।৯।৩।] অর্থাৎ অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এই অষ্ট বসু। কারণ মহাবিশ্বের সকল পদার্থ এদের মধ্যেই নিহিত আছে। সেই জন্য এদের নাম বসু।

★ একাদশ রুদ্রঃ [দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।৯।৪] অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ উপপ্রাণ এই দশ এবং জীবাত্মা মিলে একাদশ রুদ্র। এই এগারো দেহান্তকালে রোদন করায়, বলে এদের

রুদ্র বলা হয়। এগুলো হচ্ছে - পঞ্চ প্রাণ: প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান, অপান। উপ প্রাণ: নাগ, কুর্ম, কৃকল, দেব, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা।

★ দ্বাদশ আদিত্যঃ [দ্বাদশ বৈ মাসাঃ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।৯।৫] সম্বৎসরে যে বারো মাস আছে, তারাই আদিত্য। কারণ এই সমস্তকে আদান করে যান। যেহেতু এই সমস্তকে আদান করে যান, অতএব তারা আদিত্য। দ্বাদশ আদিত্য হচ্ছে - চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন।

★ ইন্দ্রঃ [স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।৯।৬] অর্থাৎ বিদ্যুৎ হচ্ছে ইন্দ্র। কারণ তা ঐশ্বর্যের সাধন। বিদ্যুৎ হতে গতি শক্তি, আলোক প্রকাশ, সমৃদ্ধি এবং সুখের সাধন প্রাপ্তি হয়।

★ প্রজাপতিঃ [য়জ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।৯।৬] যজ্ঞ হচ্ছে প্রজাপতি। কারণ এর দ্বারা বর্ষা হয়, প্রাণিদের সুখ মেলে। গীতা ৩।১৪ মধ্যে বলা হয়েছে - প্রাণী অন্ন থেকে, অন্ন বৃষ্টি থেকে এবং বৃষ্টি যজ্ঞ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে যজ্ঞ প্রাণীদের জীবন ও সুখের আধার।

- পুরাণে ৩৩ কোটি দেবতার উল্লেখ আমরা নানা স্থানে পাই। যেমন,

দেবাকোট্যস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্গণাঃ কোট্যযুতদ্বয়ম্ ।

নবকোট্যস্তু চামুণ্ডা ভৈরব্যঃ কোটিসংমিতাঃ ॥

স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড ৬২.৯৯৩৩

= কোটি দেবতা, ২০ কোটি শিবগণ, ৯ কোটি চামুণ্ডা, ১ কোটি ভৈরবী ও ৮ কোটি স্কন্দ অনুচর যারা কিনা ষড়ানন ও ময়ূরবাহন তারা এলেন।

অন্যদিকে,

সরূপাসূত ভূতস্য ভার্যা রুদ্রাংশ্চ কোটিশঃ।

রৈবতোঽজো ভবো ভীমো বাম উগ্রো বৃষাকপিঃ।

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বহুরূপো মহানিতি।

ভাগবত ৬.৬.১৭-১৮ অনুযায়ী, দক্ষনন্দিনী সরূপা থেকে কোটি কোটি রুদ্রগণের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। যাদের মধ্যে ১১জনকে প্রধান বলা হয়েছে।

যদিও স্কন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ডের চতুরাশীতি লিঙ্গ মাহাত্ম্য ৫২.১২ অনুযায়ী 'পূর্বং দেবগণাশ্চৈব ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবতাঃ' প্রথমে ৩৩ দেবতার উৎপন্নের কথা লেখা হয়েছে তবে প্রাগুক্ত অনুচ্ছেদ বহুদেবতাবাদের চূড়ান্ত রূপকেই দেখায়। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য ২১.১১-১২ 'আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানলোঽনিলঃ/ প্রত্যূষশ্চ

প্রভাসশ্চ বসবোষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ' ও স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডের তীর্থমাহাত্ম্যের ১৪৫.৪০-৪১ 'ততোঽষ্টৌ বসবস্তত্র দ্বাদশার্কাস্তথৈব চ/একাদশাপরে রুদ্রা নাসত্যৌ দ্বৌ চ সুন্দরৌ' ৩৩ দেবতার যে সূচি প্রদান করে তা বৃহদারণ্যকোক্ত সূচি থেকে ভিন্ন।

সেখানে ৮ বসু হলো ধর, ধ্রুব, সোম, মখ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস; ১১ রুদ্র বৃষধ্বজ, শর্ব্ব, মৃগব্যাধ, অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, বৃষাকপি, রুদ্র, ত্র্যম্বক; ১২ আদিত্য হলো বরুণ সূর্য, ভানু, তপন, ইন্দ্র, অর্যমা ধাতা, ভগ্, গভস্তি, ধর্মরাজ, স্বর্ণয়েতা, দিবাকর, মিত্র, বাসুদেব। ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে বাদ দিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ২টি দেবতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ ২৬৮-৬৯, ২১৯; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড অধ্যায় ৫-৬; শিবপুরাণ রুদ্রসংহিতার যুদ্ধখণ্ডে অধ্যায় ৩৩.৬-৩৫ আলাদা আলাদা দেবতা তালিকা প্রদান করে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৫০ অধ্যায়, শান্তিপর্বের ৩৪০ অধ্যায় শল্যপর্বের ৪৫ অধ্যায়েও একই তালিকা আছে যা পুরাণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণ তথা বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে ভিন্ন। মহাভারতের বনপর্ব ২১৩.১৯ স্পষ্টভাবে ৩৩ কোটি বা ৩৩০ মিলিয়ন দেবতাকেই স্বীকার করে।

স্বামী রামসুখদাস [সাধকসঞ্জীবনী টিকা ১১.৬] ৩৩টি দেবতাকে স্বীকার করেই তাদের বাকি দেবতাদের মধ্যে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করেছেন, শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২০.৩২৪ এর প্রবচনেও [661223CC.NY - December 23, 1966] 'Koti means ten millions' বলে কোটি অর্থ প্রকারকে একপ্রকার নস্যাৎ করেছেন।

অনেকেই বলতে পারেন, শতপথ ব্রাহ্মণ ১২.৬.১.৩৭ 'ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবাঃ প্রজাপতিশ্চতুস্ত্রিংশঃ' অনুযায়ী প্রজাপতিকে ৩৪ তম দেবতা বলা হয়েছে। তারা ভুলে যান এখানে প্রজাপতি অর্থ স্রষ্টা। পুরাণে বিভিন্নতা থাকলেও স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের চতুরাশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্য ৩৪.১ 'চতুস্ত্রিংশত্তমং বিদ্ধি দেবং বৈ কন্থডেশ্বরম্' কথিত কন্থডেশ্বরম্ মূলত: শৈব ইষ্টকেই নির্দেশ করে । তিনিই সকল দেবের দেব বা মহাদেব বলে খ্যাত হয়েছেন বেদেই - সোর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ ~ অথর্ববেদ ১৩.৪.৪। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে তথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে পিতামাতাকেও দেব বলা হয়েছে, তবে তারা কী এই ৩৩ প্রকারের বাইরে ? প্রকৃতপক্ষে রুদ্রে যে জীবাত্মার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটিই মূলত দেব হিসেবে মাতা-পিতা-আচার্য-অতিথি হিসেবে বিধৃত। 'একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা ইমে এব দ্যাবাপৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশ্যৌ ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবাঃ প্রজাপতিশ্চতুস্ত্রিংশস্তদেনং' শতপথ ব্রাহ্মণ ৪.৫.৭.২ দ্যুলোক ও পৃথিবীকে ৩২-৩৩ উল্লেখ করে, দেব না । মূলেই শুরুতে বলা হয়েছে 'চতুস্ত্রিংশদ্ব্যাহৃতয়ো ভবন্তি প্রায়শ্চিত্তয়ো নামৈষ বৈ প্রজাপতির্য এষ যজ্ঞস্তায়তে যস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজাতা

এতস্মেবাপ্যেতর্হ্যনু প্রজায়ন্তে' অর্থাৎ এখানে দেবতা নয় বরং প্রায়শ্চিত্তির আলোচনা চলছে, ৩৩ ব্যাহৃতির কথা বিদ্যমান। 'চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বি চষ্টে সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন' ঋগ্বেদ ১০.৫৫.৩ ৩৪ প্রকার বিকার বা বিভিন্নতা নির্দেশ করে যেখানে বষটকার ও বিরাট উল্লেখিত। এখানে জাগতিক সৃষ্টিরচনাতে বিদ্যমান উপাদানের উল্লেখ রয়েছে। সাদৃশ্য মাত্রেই একই বিষয়ের আলোচনাই হয়েছে এটা কীভাবে আগেই ঠিক করে নেওয়া যায় ? তাই এধরনের পূর্বাগ্রহযুক্ত সমালোচনা পরিত্যাজ্য।

নিরুক্তে দেব শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। 'দেবো দানদ্বা দীপনাদ্বাদ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা। য়ো দেবঃ সা দেবতা।' নিরুক্ত ৭।১৫ অর্থাৎ দেবের লক্ষণ হচ্ছে দান। সবার হিতার্থে যে দান করে, সে দেব। দেবের গুণ হচ্ছে দীপন অর্থাৎ প্রকাশ করা। সূর্য,চন্দ্র, অগ্নি প্রকাশ করে বলে তাদের দেব বলা হয়। দেবের কর্ম হচ্ছে দ্যোতন অর্থাৎ সত্যোপদেশ করা। অর্থাৎ যে মানুষ সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য উপদেশ দান করেন, তিনি দেব। দেবের বিশেষত্ব হচ্ছে দ্যুস্থান অর্থাৎ ওপরে স্থিতি লাভ। ব্রহ্মাণ্ডের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য সূর্যকে, সমাজের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য বিদ্বানকে এবং রাষ্ট্রের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য রাজাকে দেব বলে।

কিন্তু অধুনা পুরাণকালে এই ধারণা ছিলো না, যেমন মহাভারতে ১.১.৪১ স্পষ্টভাবেই

'ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।

ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবনাং সৃষ্টিঃ সঙ্ক্ষেপলক্ষণা॥'

অর্থাৎ ৩৩ হাজার, ৩৩শত, ৩৩ অর্থাৎ মোট ৩৬৩৩৩ দেবতার সৃষ্টির উল্লেখ করে।

লিঙ্গপুরাণ ২.৫৬.১০-১৩ ও বিষ্ণুপুরাণ ২.১২.১৭ অনুযায়ী,

ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা দেবাঃ পিবন্তি ক্ষণদাকরম্॥

অর্থাৎ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধা পান করেন।

প্রসঙ্গতঃ অনেকেই বলবেন, বেদে ৩৩৩৯ দেব যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা কি ভ্রান্তি নয় ? যারা এটি বলেন তারা মূলতঃ অজ্ঞ, কেননা বৃহদারণ্যক ৩.৯.২ স্পষ্টভাবেই বলেছে যে এই সংখ্যা অর্থাৎ ৩০৩ হোক বা ৩০০৯ হোক সবই ৩৩ এর মহিমাসূচক, অর্থাৎ যেভাবে শাস্ত্রে সহস্র শব্দ অসংখ্য বা প্রচুর বোঝাতে ব্যবহার করা হয় তেমনি ৩৩ এর বাহুল্যও মূলতঃ ৩৩ এর নানা প্রকাশ বা ক্ষমতার সূচক । পুরাণের মতো স্বতন্ত্র শরীরধারী দেবতার প্রসঙ্গ এখানে মোটেও প্রযোজ্য নয়।

প্রমাণ হিসেবে স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ডের তীর্থমাহাত্ম্য ২৭৩.৭ 'ত্রয়স্ত্রিংশৎপ্রমাণতঃ কোটয়ঃ' = ৩৩ কোটি দেবতার আবির্ভাব-তিরোভাব উল্লেখ করে। পাশাপাশি স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের কুমারিকাখণ্ড ৪৭.৪৮ 'ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভিঃ কোটীভির্দেবীভিঃ পূজিতা চ' = ৩৩ কোটি দেবীর উল্লেখও করে। ৩৩ মানে যে পুরাণকার মোটেও প্রকার বুঝেননি তার স্পষ্ট প্রমাণ স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের কুমারিকাখণ্ড ২৫.৯৩ যাতে ৩৩ কোটি ৩৬ হাজার ৩৩ দেবতার কথা আছে।

বায়ুপুরাণের ১০১তম অধ্যায়ে ৯২-৯৭ শ্লোকে একটি সংখ্যা গণনা পদ্ধতি আছে। তার সাহায্যে যদি আমরা স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডের তীর্থ মাহাত্ম্যের ১৪২.২০-২৬ শ্লোকে গণের সংখ্যা বিশ্লেষণ করি তবে ৩,০৮,০০,০৭,২৮,৫৫,৩১,৯০০। পাশাপাশি ৩৩ কোটি দেবতার উল্লেখ তো আছেই।

সরিতাং পতয়স্ত্রিংশচ্ছঙ্কবঃ সপ্তসপ্ততিঃ ॥

মহাসরোজষষ্টিশ্চ নিখর্বাণাং চ বিংশতিঃ ॥২০॥

অর্বুদায়ুতসংযুক্তাঃ কোট্যো নবতিপঞ্চ চ ॥

লক্ষাশ্চ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥

শতানি নবষষ্টিশ্চ গণাশ্চান্যেঽত্র সংস্থিতাঃ॥২১॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎস্মৃতাঃ কোটয়ো দেবানাং যাঃ স্থিতা দিবি ॥

তাঃ সর্বাস্তত্র চাগত্য তস্য চক্রুশ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২৬ ॥

বৈদিক তেত্রিশ প্রকার দেব এর মধ্যে কেবল জীবাত্মা চেতন। ইহা অন্যের উপযোগ করে অথবা স্বয়ং অন্য জীবাত্মার উপযোগে আসে। যেমন গাভী দুধ দিয়ে, ভেড়া ঊণ [লোম] দিয়ে, ষাঁড় হাল চাষের উপযোগে আসে। তেমনি সৈনিক, বৈদ্য আদিও উপযোগে আসে। জীবাত্মার অতিরিক্ত শেষ বত্রিশ দেব জড় এবং উপযোগের দেব বলা হয়। মাতা, পিতা,আচার্য, অতিথি এবং পতি-পত্নী দ্বারা সংসারের ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এ জন্য এই পাঁচ কে ব্যবহারের দেব বলা হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আমরা এইরূপ দেবতাদেরই দেখতে পাই এবং তাদের পূজনের কথা পাই। "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য়দেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।২। তবে দেব হবেন তিনিই, যাঁর মধ্যে উত্তম গুণাবলী তথা বিভিন্ন দৈবী সম্পদ [গীতা ১৬।১-৩] রয়েছে। পিতামাতা, আচার্য, পতি-পত্নী প্রত্যেকে আদর্শ আচরণ না করলে তারা দেব হিসেবে আখ্যার যোগ্য হবেন না।

ওপরে যে তেত্রিশ প্রকার দেবের বর্ণনা করা হলো, এদের থেকে সুখ যেমন লাভ হয় তেমনই দুঃখ লাভ হতে পারে। অগ্নি দেব, কিন্তু অনেক সময় সবকিছু জ্বালিয়ে দেয়; অতিথি দেব কিন্তু পরবর্তীতে শত্রু ও হতে পারে। রাজা দেব, কিন্তু দুরাচারী হয়ে দুঃখদায়ী হতে পারে। এই কারণে তা সদুপযোগ এবং সৎকারের মর্যাদা দ্বারা

বদ্ধ। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এর সদুপযোগ করা মর্যাদা। মাতা, পিতা আচার্য এবং অতিথির সেবা করা ধর্ম। পূর্বজ মহাপুরুষের বেদানুকূল পথ অনুসরণ, সংবিধান পালন এবং দেশের রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু এরা কোনো উপাস্য দেব নয়। এরা পূজনীয়, পূজা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও উপযোগকে বোঝায়। পরমাত্মাসহ সকলেই পূজনীয়, কিন্তু সর্বোচ্চ পূজনীয় এবং মোক্ষের নিমিত্তে একমাত্র উপাস্য দেব কেবল পরমাত্মা, কারণ পরমাত্মাই সবার ইষ্ট দেব। এই সৃষ্টির সব কাল এবং পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ণতম দেব এক এবং সেই পরমাত্মা। সেই জন্য পবিত্র বেদ আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন -

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত। ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত॥ [অথর্ববেদ ২০।৮৫।১]

= হে মিত্র! পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা কোরো না এবং দুঃখী হয়ো না। এই উৎপন্ন জগতের সাথে মিলে সেই শক্তিশালী শত্রুর নাশকারী প্রভুর স্তুতি করো এবং বারবার উক্ত স্তোত্রের উচ্চারণ করো।

অর্থাৎ আমাদের শুধু সেই এক পরমাত্মারই উপাসনা করা উচিৎ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে স্বামী স্ত্রীর প্রেম

।।অথর্ববেদ ষষ্ঠ কাণ্ড।।

।।অষ্টম সূক্ত।।

যথা বৃক্ষং লিবুজা সমন্তং পরিষস্বজে ।

এবা পরি ষ্বজস্ব মাং যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥১॥

পদার্থ– (যথা) যেভাবে (লিবুজা) লতা (বৃক্ষম্) বৃক্ষকে (সমন্তম্) সব দিক থেকে (পরিষস্বজে) দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে, (এবা) তেমনি ভাবে (মাম্) আমাকে (পরি ষ্বজস্ব) তুমি প্রেমপূর্বক আঁকড়ে ধরো। (যথা) যার ফলে তুমি (মাম্) আমাকে (কামিনী অসঃ) অনন্য চিত্তে কামনা করো, (যথা) যার ফলে তুমি (মৎ) আমার থেকে (অপগাঃ) বিচ্যুত (ন অসঃ) হও না। ॥১॥

যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্ ।

এবা নি হন্মি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্ নাপগা অসঃ ॥২॥

পদার্থ– (যথা) যেভাবে (সুপর্ণঃ) পাখি (ভূম্যাম্) ভূমিতে (প্রপতন্) বেগে নামতে থেকে (পক্ষৌ) পাখা দুটিকে (নিহন্তি) শিথিল [নিশ্চল] করে দেয়, (এবা) তেমনি ভাবে (তে) তোমার জন্য (মনঃ) আমার মন (নি হন্মি) নিশ্চল [সমর্পণ] করে দেই। (যথা) যার ফলে তুমি (মাম্) আমাকে (কামিনী অসঃ) অনন্য চিত্তে কামনা করো, (যথা) যার ফলে তুমি (মৎ) আমার থেকে (অপগাঃ) বিচ্যুত (ন অসঃ) হও না। ॥২॥

যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ ।

এবা পর্যেমি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্ নাপগা অসঃ ॥৩॥

পদার্থ– (যথা) যেভাবে (সূর্যঃ) সূর্য (সদ্যঃ) শীঘ্রই উদয় হতেই (দ্যাবাপৃথিবী) আকাশ ও পৃথিবীতে (পরি-এতি) [সূর্য রশ্মি] ব্যাপ্ত হয়ে যায়, (এবা) তেমনি ভাবে (তে মনঃ) তোমার মনে আমি (পর্যেমি) অতি দ্রুত ব্যাপ্ত হয়ে যাই। (যথা) যার ফলে তুমি (মাম্) আমাকে (কামিনী অসঃ) অনন্য চিত্তে কামনা করো, (যথা) যার ফলে তুমি (মৎ) আমার থেকে (অপগাঃ) বিচ্যুত (ন অসঃ) হও না। ॥৩॥

।।অথর্ববেদ ষষ্ঠ কাণ্ড।।

।।নবম কাণ্ড।।

বাঞ্ছ মে তন্বং পাদৌ বাঞ্ছাক্ষ্যৌ বাঞ্ছ সক্থ্যৌ ।

অক্ষ্যৌ বৃষণ্যন্ত্যাঃ কেশা মাং তে কামেন শুষ্যন্তু ॥১॥

পদার্থ– তুমি (মে) আমার (তন্বম্) শরীরকে (বাঞ্ছ) মন থেকে কামনা করো, (পাদৌ) পা দুটিকে (বাঞ্ছ) মন থেকে কামনা করো, (অক্ষ্যৌ) চোখ দুটিকে, (সক্থ্যৌ) ঊরু দুটিকে (বাঞ্ছ) কামনা করো। [অর্থাৎ আমার প্রত্যেক অঙ্গকে তুমি মন থেকে কামনা করো]। (বৃষণ্যন্ত্যাঃ) আমার প্রতি কামনাকারী (তে) তোমার (অক্ষ্যৌ) দুটি চোখ এবং (কেশাঃ) কেশগুচ্ছ (মাম্) আমাকে (কামেন) তোমার প্রবল কামনা দ্বারা (শুষ্যন্তু) সুখ প্রদানকারী হোক। ॥১॥

মম ত্বা দোষণিশ্রিষং কৃণোমি হৃদয়শ্রিষম্ ।

যথা মম ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥২॥

পদার্থ– আমি (হৃদয়শ্রিষম্) হৃদয়ে আশ্রিত [বসবাসকারী] (ত্বা) তোমাকে (মম) আমার (দোষণিশ্রিষম্) বাহুতে আশ্রিত [আলিঙ্গন] (কৃণোমি) করব। (যথা) যার ফলে তুমি (মম) আমার (ক্রতৌ) হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে (অসঃ) অবস্থান করো এবং (মম) আমার (চিত্তম্) চিত্ততে (উপায়সি) এসে বসবাস করো। ॥২॥

যাসাং নাভিরারেহণং হৃদি সংবননং কৃতং গাবো ঘৃতস্য মাতরোঽমূং সং বানয়ন্তু মে ॥৩॥

পদার্থ– (যাসাং) যার (হৃদি) হৃদয়ে (নাভিঃ) স্নেহ, (আরেহণম্) প্রশংসা এবং (সংবননম্) ভক্তি পরস্পর যুক্ত (কৃতম্) করা হয়েছে, (ঘৃতস্য) ঘৃতের (মাতরঃ) মাতৃরূপ (গাবঃ) গাভীর ন্যায় (অমূং) এই প্রিয়তমাকে (মে) আমার জন্য (সং বানয়ন্তু) প্রেমপূর্বক প্রেরিত করো।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ভাষ্যকার– পণ্ডিত জয়দেব বেদালঙ্কার ও পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদীর অথর্ববেদ ভাষ্য অনুসারে।

অনুবাদক– প্রিয়রত্ন।

কলিযুগে কি মানুষ বেদ অনুযায়ী চলতে পারবে ?

বেদ ঈশ্বরীয় শাশ্বত কল্যাণকারিণী বাণী । পরম পিতা পরমাত্মা অনাদি কাল হতে বারংবার - সগৌরবে জীব মাত্রের কল্যাণের নিমিত্তেই ঋষিদের শুদ্ধান্তঃকরণে বেদজ্ঞান প্রকাশিত করেন । সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বেদ - বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্ [মনুস্মৃতি ২।৬] । শাস্ত্রে বারংবার বলা হয়েছে বেদানুকূল সিদ্ধান্তই ধর্ম ও তদ্বিরীত অধর্ম - "ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"[মনুস্মৃতি ২।১৩] অর্থাৎ , যে ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত

করতে চায় তার জন্য বেদই মূখ্য প্রমাণ । এখন প্রশ্ন হচ্ছে কলি যুগে বেদের আবশ্যকতা কী ? বা কলি যুগে বেদ অনুযায়ী আমরা চলতে পারবো কিনা । যেখানে সনাতন ধর্মের আদি মূল প্রধান গ্রন্থই বেদ তাহলে এই প্রশ্নই অবান্তর যে বেদ অনুযায়ী চলা যাবে কিনা । যেরূপ পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনাদি , তাই তার প্রদান কৃত জ্ঞান ও অনাদি । সনাতন অর্থ যা অনাদি , অনন্ত - তাই যে জ্ঞান অনন্ত কাল ধরেই বিদ্যমান তাই সনাতন । গীতায় স্পষ্ট উল্লখ আছে -

🍁 বেদই ব্রহ্ম থেকে এসেছে ও কর্মও বেদ থেকেই প্রদত্ত -

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

[গীতা ৩।১৫]

অর্থ:- কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে । বেদ অবিনাশী অক্ষর [ক্ষয় রহিত পরমাত্মা] থেকে উৎপন্ন । সেজন্য সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য (সবসময়) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ।

অতঃ এই শ্লোকদ্বয় থেকে স্পষ্ট যে , বেদ অনাদি জ্ঞান যার কোনো আদি এবং অন্ত নেই , তাই এই জ্ঞানই সনাতন ।

🍁 বেদ দ্বারাই পরমেশ্বরকে জানতে হবে

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

[গীতা ১৫।১৫]

অর্থ:- আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছি । আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন (হয় এবং সকল বেদ দ্বারা আমিই জানার যোগ্য । আমিই বেদান্তের কর্তা এবং বেদের জ্ঞাতা ।

🍁 এবার বেদ সম্পর্কে মহাভারত কি বলছে দেখি -

“অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা য়তঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥

[মহাভারত শান্তি পর্ব- ১২।২৩২।২৪]

অনুবাদ- সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা এই বেদ বাণী প্রকাশিত হয়েছিল যার না আদি আছে , না অন্ত , যা নিত্যনাশরহিত এবং দিব্য । যা থেকে জগতের সমস্ত প্রবৃত্তির প্রকাশ পেয়েছে ।

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে এই বেদ বাণীর আদি নেই অন্ত নেই । সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে , এই বেদ জ্ঞানই সনাতন । আর তা যুগের সাথে কখনো ছিন্ন হয়না ।

🍁 এবারে সরাসরি বেদ হতে দেখি -

অংতি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি।

দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।

[অথর্ববেদ ১০।৮।৩২]

সরলার্থঃ মনুষ্য সমীপবর্ত্তী পরমাত্মাকে দেখেও না , তাকে ছাড়তেও পারে না । পরমাত্মার কাব্যকের দেখ , তা মরেও না , জীর্ণও হয় না ।

অর্থাৎ বেদ সকল যুগ ও কালের জন্য প্রযোজ্য ।এর বাণী কখনো অপ্রাসঙ্গিক হয়না ,অচল হয়না । বেদ মন্ত্র কলিযুগে নিষ্ক্রিয়-এ ধরনের প্রলাপ তাই অনর্থক।সর্বযুগেই সমানভাবে প্রযোজ্য ও তা সর্বদা আধুনিক।

🍁 যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন -

য়ঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

[গীতা ১৬।২৩]

= যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না।

তাহলে প্রতিনিয়ত গীতার কথা শ্রবণ করেও যারা এই বাক্যে মনোনিবেশ করে না তাদেরকে জন্য ভগবান আরো স্পষ্ট করেই বলেছেন ,

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

[গীতা ১৬।২৪]

= শাস্ত্রই প্রমাণ কর্তব্য ও অকর্তব্য কী হবে সেই বিষয়ে । অর্থাৎ আমার কী করা উচিত বা অনুমোদিত কিংবা কী করা অনুচিত বা নিষিদ্ধ তা আমাকে বলবে শাস্ত্র । এবং সেই শাস্ত্রবিধান জেনেই কর্ম করতে হবে ।

নব্য শাস্ত্রানভিজ্ঞদের কাছে বিনীতভাবে প্রশ্ন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এতো মানেন তাহলে তার এই বাক্যদ্বয় কি কখনো আপনারা দেখেননি বা পড়েননি ? যদি না পড়ে থাকেন তবে শাস্ত্রীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার দুঃসাহস কীভাবে করেন ? আর যদি পড়েই থাকেন তবে তা অনুসরণ না করা কি ভগবদ্‌বাক্যে বিদ্রোহ করা নয় কি ? আর এভাবেই আপনি জ্ঞানচর্চায় সিদ্ধান্তভূষণ (!) সনাতনী ?

ভগবান তো বলতেই পারতেন ' যাও হে তোমরা মনে চায় তাই করো ', কিন্তু তিনি তা বলেননি । কেননা এটা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝতে মানুষ স্বভাবতই অল্পজ্ঞ ও প্রভাবিত হয় স্বার্থ দ্বারা । এজন্যই ভগবান মনু তার স্মৃতিতে

[২।১২] বেদ , স্মৃতি, সদাচার ও প্রিয়কর্ম এই ৪টি বিশেষ লক্ষণ দিয়েছেন । যা বেদে সূক্ষ্মরূপে রয়েছে তার পালনীয় বিধি স্মৃতিতে বিদ্যমান, স্মৃতিতে যা বিদ্যমান বা অনুল্লেখিত তা সাধুদের আচারে প্রমাণ, আর তাও না পেলে বিবেক বাণী । অর্থাৎ আপনি যদি বেদে না পান তবেই সূক্ষ্ম সেই বিষয়ে ক্রমান্বয়ে পরের পথগুলো অনুসরণ করবেন । কিন্তু স্বার্থপরদের তার সময় কোথায় ?

সনাতন আইনশাস্ত্র তথা মানবজাতির প্রধান ধর্ম গ্রন্থ বেদ । কয়েকশতক আগেও বেদ শব্দটি ছিল প্রতিটি সনাতনিদের প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত । কিন্তু সময়ের বিবর্তনে , অজ্ঞানতা ও তার কালগ্রাসে ঔপনিবেশিকদের চক্রান্তে , তথাকথিত বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত ধর্মপ্রচারক তথা স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আজ মহান বেদের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছি । ফলস্বরূপ আমরা আজ জাতি হিসেবে এক ক্রান্তিলগ্নে দাড়িয়ে । জ্ঞানের অভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে অপমানের স্বীকার তো হতেহচ্ছে বটেই , এবং নিজেদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনেও অজ্ঞতার গ্লানিবয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে নিরন্তর ।

পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রভৃতির দ্বারা জানা যায় , কিন্তু যা অপার্থিব , অচিন্তনীয় , অনুমানের অতিত তা জানতে হলে বেদই একমাত্র অবলম্বন । বেদ কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত নহে , তাহা অপৌরষেয় এবং নিত্য । অপৌরুষেয় বলেই বেদ নিত্য ।

"তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া"
ঋগবেদ ৮.৭৫.৬

"সদকারণবন্নিত্যম্" (বৈ০ দ০ ৪।১।১)
কারণ রহিত ভাবরূপ পদার্থ হলো নিত্য ।
যে বস্তু সদা বিদ্যমান ও কখনো নিজের সত্তার জন্য অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয় তাকেই নিত্য বলে । নিত্য বস্তু উৎপত্তি রহিত , নিরবয়ব ও ত্রিকালবর্তী হয় ।

বেদান্ত দর্শন-
অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥
ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৯
পদার্থঃ
এই (বেদ) থেকে শুধুমাত্র নিত্যতা হয় ।

সৃষ্টির আদি থেকে বেদ যা ছিল , তাই আছে । তাই সত্যযুগ আসুক , কি ত্রেতা , দ্বাপর , কলিযুগ আসুক । বেদ তো বেদই , কোন কল্পে বা মতান্তরে তার পরিবর্তন হয় না এবং সদা সর্বদা বর্তমান । বেদ ঈশ্বরের নিত্য বিদ্যা , তার উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি হতেই পারে না । অতঃ তার বৃদ্ধি , ক্ষয় অথবা তাতে কোন পরিবর্তন ঘটতে

পারে না । এইসব কারণে বেদ প্রতিপাদিত বৈদিক ধর্ম শ্বাশত , সত্য ও সনাতন । যেখানে বেদ বলছে এটা সব যুগের জন্য প্রযোজ্য সেখানে কতিপয় বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত অজ্ঞানীদের এহেন আচরন হাস্যজনক ।

তাছাড়া এসব অবান্তর যুক্তি যারা পেশ করেন তারা নিজেরা কি আদৌও কখনো বেদ পড়েছেন তাদের কথার সত্যতা যাচাই এর জন্য ? তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি ,পারলে বেদের এমন কোন নিয়ম দেখান যা বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য নয় ? বরং এটা কলি যুগে আরও বেশি প্রয়োজন কারণ বেদের কর্মকাণ্ড প্রতিদিনের নিত্যকর্মাদি , বিজ্ঞান , আইন , অর্থনীতি , রাজনীতি জ্ঞান কর্ম উপাসনা অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সহ মানব জাতির প্রয়োজনীয় সকল কিছু আছে যা সত্য যুগের তুলনায় কলি যুগেই বেশী দরকার ।

সৃষ্টির প্রথম হতে আরম্ভ করে আজও সেই বেদ জগতে প্রচারিত । বেদ ঈশ্বরীয় জ্ঞান , তাই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিন কালেই সমানভাবেই একই অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জ্ঞানের নাশ নাই কারণ ঈশ্বর অবিনাশী । এ জ্ঞান কল্যাণকারী কারণ ঈশ্বর কল্যাণময় । বেদ নিত্য , সনাতন কারণ ঈশ্বর নিত্য ও সনাতন ।

তারা আরেকটি প্রশ্ন করেন বেদের বৃহৎ কলেবর নিয়ে যেটা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন । কারণ বৈদিক যুগেও এমন খুব কম লোকই ছিলেন যারা কিনা সব কটা বেদ জানতেন । কেউ বা একটা , কেউ বা দুটা ,কেউ তিনটা , কেউবা চারটাই জানতেন যাদের যথাক্রমে একবেদী , দ্বিবেদী , ত্রিবেদী ও চতুর্বেদী বলা হত । তবে ত্রিবেদী ও চতুর্বেদী ছিল হাতে গোনা । একবেদীরাই ছিল সর্ব্বোচ্চ । আর তাছাড়া কেউই আমাদের বেদ মুখস্ত করতে বলছেনা । আর এ ধরনের প্রচারকারীদের মধ্যে অনেকেই বলেন পুরাণ পড়ার কথা ! এখন আপনারা ই বলুন , যেখানে চার বেদের মন্ত্রসংখ্যা ২০৩৭৯ সেখানে এর বদলে এর কয়েকগুন বড় একটা পুরাণ পড়তে বলাটা কতটুকু যৌক্তিক ?

এখন আসি পবিত্রতার বিষয়ে । অনেকেই বলেন বেদপাঠ করার মত পবিত্রতা কলিযুগের মানুষের নেই এবং নারী তথা শূদ্রদের বেদাধিকার নেই । তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করুন-বেদের মতো পবিত্র গ্রন্থ যদি পাঠ করার মতো পবিত্রতা না থাকে তাহলে তাদের হরিনাম যা সবচেয়ে পবিত্র তা জপ করার পবিত্রতা সবার থাকবে কি করে ? সবচেয়ে খারাপ , অপবিত্র লোকটিও নিজেকে বেদপাঠের মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ করতে পারে ন । আর বেদ পাঠে অধিকার সবার সমান্য । বেদ পাঠে কোন মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করা হয় নি ।

তাই তো পবিত্র বেদ ঘোষণা করছে -

যথেমাং বাচং কল্যানীমাবদানিজনেভ্যঃ। ব্রহ্ম রাজান্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্যায় চ স্বায় চারণায়।প্রিয়ো দেবানংদক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভুয়াসময়ং মে কামংসমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু।। (যজুর্বেদ ২৬।২)

সরলার্থঃ পরমেশ্বর সকল মনুেষ্যর প্রতি উপদেশ দিচ্ছেন - ব্রহ্মণ , ক্ষত্রিয়, শূদ্র ,বৈশ্য , স্বীয় স্ত্রীর ও সেবকাদি এবং অন্যান্য সকল মনুষ্যকেই যেমন আমি এই মঙ্গলদায়িনী বেদবাণীর উপদেশ দান করেছি , তোমরাও সেরূপ করো ।

বেদের এই মন্ত্র থেকে স্পষ্ট যে বেদপাঠে সবার অধিকার সমান । গত কয়েকশবছরে , যখন বেদজ্ঞান এর অভাবকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী ও তথাকথিত ব্রাহ্মণ পরিচয় ধারী যারা তৈরী করেছিল অস্পৃশ্যতা নামক জঘন্য প্রথা । একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো দুরের কথা,অনেকেই একে অপরকে নিজেদের বানানো ছোট জাত বিবেচনা করে ছুঁতও না ।

অথচ পবিত্র বেদ বলেছে-

সমানী প্রপা সহ বোরন্নভাগঃ সমানে যোক্তো সহ বো যুনজমি।

সমঞ্চোহগ্নিং যপর্যতারা নাভি মিবাভিতঃ।।

[অথর্ববেদ ৩।৩০।৬]

সরলার্থঃ তোমাদের পান একসঙ্গে হোক , ভোজনও একসঙ্গে হোক । তোমাদিগকে এক সঙ্গে একই প্রেমবন্ধনে যুক্ত করিয়াছি । সকলে মিলিয়া পরমাত্মাকে পূজা করো । রথচক্রের কেন্দ্রের চারিদিকে যেমন অর থাকে তোমরা সেইভাবে থাকো ।

ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্রে মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের আদেশ -

সমানী বঃ আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো য়থা বঃ সুসহাসতি।।

[ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৪]

সরলার্থঃ হে মানুষ্য ! তোমাদের সকলের লক্ষ্য এক হোক, তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, তোমাদের মন এক হোক । এই ভাবে ভাবিত হয়ে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক ।

অনেকেই বলে বেদ নাকি শুধু যজ্ঞের জন্য । বেদে শুধু অপরা বিদ্যা আছে । বেদ পড়লে শুধু স্বর্গ প্রাপ্তি হয় মোক্ষলাভ নয় যদিও স্বর্গ-নরক বলতে আলাদা কোন কাল্পনিক জায়গার অস্তিত্ব নেই বৈদিকশাস্ত্র সমূহে , অবশ্য স্বাধ্যায় বিহীন অসংস্কৃতজ বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যাক্তিগণ কিভাবে জানবে ? তারাতো তথাকথিত পরম্পরার নামে ভণ্ডামি করতেই সময় পার করে দেয় । তাদের অনর্থক দাবির সত্যতা পর্যালোচনা করা যাক ।

বেদ দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না । এখন কেউ যদি কুতর্ক করে একগুঁয়ে স্বভাব ধরে বলে না , শুধু উপনিষদই পরাবিদ্যার গ্রন্থ তাহলে বলতে হয় উপনিষদের তালিকায় প্রথম যে , ঈশোপনিষদ্ তা তো পুরোটাই যজুর্বেদের ৪০ তম অধ্যায় । এখানে আপনি যদি এই উপনিষদকে পরাবিদ্যার গ্রন্থ মান্য করেন তবে তো পরোক্ষভাবে বেদেই পরাবিদ্যা মান্য করলেন । শুধু ঈশোপনিষদ্ নয় , যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায় তো অধিকাংশ উপনিষদেরই বিভিন্ন জায়গাতে বেদের মন্ত্র সরাসরি এসেছে । যথাঃ

.

কঠোপনিষৎ

(i) অধ্যায় ২।১।১৮ (ঋগবেদ ৩।২৯।২)

(ii) অধ্যায় ২।১।৯ (অথর্ববেদ ১০।৮।১৯)

(iii) অধ্যায় ২।২।২ (যজুর্বেদ ১০।২৪)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

(i) অধ্যায় ২। ১-৫ (যজুর্বেদ ১১।১-৫)

(ii) অধ্যায় ৩।১৪-১৫ (যজুর্বেদ ৩১।১-২)

(iii) অধ্যায় ৩। ৫-৬ (যজুর্বেদ ১৬।২-৩)

★ প্রশ্নোপনিষৎ

(i) প্রথম প্রশ্ন ১১ (ঋগবেদ ১।৬৪।১২)

★ ঐতেরীয়পনিষৎ

(i) শিক্ষাবল্লী প্রথম অনুবাক (ঋগবেদ ১।৯০।৯)

(ii) শিক্ষাবল্লী দ্বাদশ অনুবাক (যজুর্বেদ ৩৬।৯)

★ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

(i) অধ্যায় ২।৫।১৬ (ঋগবেদ ১।১১৬।১২

(ii) অধ্যায় ২।৫।১৭ (ঋগবেদ ১।১১৭।২২)

(ii) অধ্যায় ২।৫।১৯ (ঋগবেদ ৬।৪৭।১৮)

যে মুণ্ডকোপনিষদে পরা অপরার ভেদ দেখানো হয়েছে সে উপনিষদেও বেদের মন্ত্র এসেছে । যথা ,

(i) মুণ্ডক ২।২।১ (অথর্ববেদ ১০।৮।৬)

(ii) মুণ্ডক ৩।১।১ (ঋগবেদ ১।১৬৪।২০)

অতঃ বেদ যদি অপরা বিদ্যার গ্রন্থই হয়ে থাকে তবে পরা বিদ্যার গ্রন্থ উপনিষদে বেদের মন্ত্র কেন গ্রহণ করা হলো ? নিশ্চয়ই বৈকুণ্ড ধাম থেকে নয়। এ থেকে স্পষ্টতঃ যে বেদে শুধু অপরা বিদ্যাই নেই বরং পরা বিদ্যাও রয়েছে । অর্থাৎ "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্" যজু০ ৪০।৮ ইত্যাদি মন্ত্রে যেখানে পরমব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হয়েছে তাহা "পরা" বিদ্যা , আর যেখানে অগ্ন্যাদি ভৌতিক পদার্থের যজ্ঞপোযোগী হওয়ার বর্ণনা অথবা বিবাহ , উপনয়নাদি সংস্কারের বর্ণনা রয়েছে তাহা "অপরা" বিদ্যা । এখানে অপরা কোন নিন্দাসূচক শব্দ নয় , বিষয়ের প্রকারের দৃষ্টি দ্বারা বিদ্যার পরা অপরা দুটি ভেদ দেখানো হয়েছে । এখন যদি কেউ বেদ পাঠ করে অর্থ না বুঝে বলে যে , বেদে পরা বিদ্যা নেই সেটা তার মূর্খতা ।

যাস্কাচার্য পরিষ্কারভাবে বলেছেন -

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতিয়োহর্থম্ ।

য়োহর্থজ্ঞইত্যকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা ॥

[নিরুক্ত নৈগম কাণ্ড ১।১৮]

অর্থাৎ- যে বেদ পড়ে তার অর্থ বোঝে না সে শুধু ভারবহনকারীই হয় , কিন্তু যে বেদের অর্থ বুঝতে পারে, সে সমস্ত সুখ আর কল্যাণ প্রাপ্ত হয় । সে ওই পবিত্র জ্ঞানের দ্বারা পাপকে নষ্ট করে পরমানন্দরূপে মোক্ষ প্রাপ্ত করে নেয় ।

🍁 মহাভারতেও একই কথা বলা হয়েছে -

য়ো বেদে চ শাস্ত্রে চ, গ্রন্থধারণতপ্তরঃ । ন চ গ্রন্থার্থতত্বজ্ঞঃ, তস্য তদধারণংবৃথা ॥ ভারং স বহতে তস্য, গ্রন্থস্যার্থ ন বেক্তি য়ঃ । য়স্তু গ্রন্থার্থতত্বজ্ঞো , নাস্য গ্রন্থাগমোবৃথা ॥

[মহাঃভারত শান্তিপর্ব অঃ ৩০৫।১৩-১৪]

অর্থাৎ - যে বেদ এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থকে ধারণ করতে তৎপর , কিন্তু তার যথার্থ তত্ত্বকে না বোঝে তার এ ধারণ করা বৃথা । যে গ্রন্থের অর্থকে না বোঝে সে কেবল উক্ত গ্রন্থের ভারই বহন করে । কিন্তু যে গ্রন্থের অর্থ বুঝতে পারে তার জন্য সেই গ্রন্থের অধ্যয়ন ব্যর্থ নয় ।

অতঃ নিষ্কর্ষ এই যে , বেদ অপরা বিদ্যার সাথে সাথে পরাবিদ্যারও গ্রন্থ । মধ্যকালে কিছু সাম্প্রদায়িক লোক প্রচার করেছে বেদে পরা বিদ্যা নেই । কিন্তু আমরা দেখিয়েছি বেদেও পরাবিদ্যার সমাহার রয়েছে , অপরদিকে উপনিষদ শুধুমাত্র পরা অথবা অধ্যাত্মবিদ্যারই গ্রন্থ , এতে লৌকিক জীবনের বর্ণনা নেই । কিন্তু সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার যে বেদ তা কেবল পরা বিদ্যার গ্রন্থ না হয়ে অপরাবিদ্যারও গ্রন্থ । বেদ যেখানে ব্রহ্মবিদ্যার মূল , তদ্রুপভাবে মানুষের লৌকিক অথবা ভৌতিক জীবনের জন্য অপেক্ষিত অনান্য জ্ঞানেরও আদিমূল ।

অবার অনেকেই বেদের চাইতে গীতাকে প্রাধান্য দেয় বেশি । এবং তাদের দাবি কলি যুগে বেদ চলে না গীতাই প্রধান । এরকম অহেতুক প্রলাব বলে যা হাস্যকর ।প্রধান হতে গেলে ভিত্তি হতে হয় । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক , আধিভৌতিক আলোচনা থাকতে হয় । সামগ্রিক ভাবে মূল জীবন বিধান থাকতে হয় । তবেই সে প্রধান হতে পারে । এই সমস্ত গুণাবলী গীতার নেই । গীতায় সহজ ভাবে উপনিষদ , দর্শন এবং অন্যান্য কিছু শাস্ত্রের খুবই অল্প আলোচনা আছে । যা দিয়ে সনাতন ধর্মের জাস্টিফাই করা সম্ভব হয়না । কিন্তু বেদ দিয়ে সম্ভব হয় । গীতা মোক্ষ প্রদান করতেই পারে কারণ গীতায় যে ব্রহ্মবিদ্যার দর্শন দেওয়া হয়েছে সেটিই বেদাদি শাস্ত্রে রয়েছে । কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বেদের ধারে-কাছেও গীতা নেই । যদি গীতাকে আমরা সনাতন ধর্মের ভিত্তি বলি তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন আসবে সৃষ্টির শুরুতে গীতা কোথায় ছিল ? যদি বলেন গীতার জ্ঞান সৃষ্টির শুরুতেই ছিল , তাহলে বলা হবে সেই জ্ঞান কীভাবে কোথায় ছিল ? উত্তর: বেদ । আর গীতা সম্পূর্ণটাই শ্রীকৃষ্ণের বানী নয় । গীতা ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে প্রদত্ত জ্ঞান । গীতায় ধৃতরাষ্ট্র , অর্জুন , সঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ ভাবে কথাবার্তা আছে । পরোক্ষ ভাবে দুর্যোধনের কথাবার্তা আছে । ইতিহাস ভিত্তিক ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সহজ উপস্থাপনায় জ্ঞান গুলো মুখনিঃসৃত হয়েছে। সেজন্য সাধারণ ভাবে গীতা সহজে বোধগম্য । কিন্তু বেদের মর্মার্থ বুঝতে হলে সাধনার প্রয়োজন হয়, আধ্যাত্মিকার স্তরে উঠতে হয় । এছাড়া আরো হাজারও পার্থক্য রয়েছে ।

গীতা হল উপনিষদের সার । অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন গীতা মূলত মুণ্ডকোপনিষদের প্রায় অবিকল প্রতিলিপি , বেদের ১ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ তথ্যও এতে নেই । গীতা একটি দার্শনিক গ্রন্থ । এটাতে সনাতনের জীবন বিধি-সংবিধান সকল আচার আচরণের নিয়ম কানুন কিছুই নেই । আর মানবজীবন ও সমাজ চালনা করতে গেলে

সেগুলোই আসল । একজন রিকশাওয়ালা বা দিনমজুর দার্শনিক ক্যাঁচক্যাঁচানি শুনবেনা , শুনবে জীবনঘনিষ্ঠ কথা যা একমাত্র বেদে রয়েছে । তাকে নিষ্কাম কর্মের অবাস্তব প্রেস্ক্রিপশন দিলে সে দৌড়ে পালাবে , বড় বড় মোটিভেশনাল স্পিকিং এ তার পেট ভরবে না । বাস্তব পৃথিবী , সমাজজীবন , ব্যক্তির দৈনন্দিন চাহিদা ও রাষ্ট্রের জন্য একমাত্র সংবিধান পবিত্র বেদ । বিয়ে , শিশুর জন্ম , অন্নপ্রাশন , ক্রিয়াকর্ম সবই বেদ থেকে হয় , গীতা থেকে নয় । অর্থাৎ , জীবনের সব বাস্তব কাজের নির্দেশিকা বেদ আমাদের দেয় , আধ্যাত্মিক কাজের নির্দেশিকাও বেদ দেয় । সোজা বাংলায় এক পরিপূর্ণ সংবিধান যা গীতা বা অন্য কোন বই নয় ।

আর তাই সকল শাস্ত্রে মুনিঋষিগণ বারবার বলে গেছেন সকল যুগে সকল কালে প্রত্যহ বেদ অধ্যয়ন করতে হবে । গীতা বা অন্যান্য সকল ছোটখাটো সেকেণ্ডারি গ্রন্থ কেবল পরবর্তীতে সময় পেলেই পড়া যায় আগ্রহের জন্য । বেদ পড়াই আসল এবং বেদ পড়লে গীতা বা অন্য কোন গ্রন্থই আর তেমন আবশ্যক থাকেনা ।

উপরন্তুঃ বেদের জ্ঞানের সাথে যদি গীতার জ্ঞানের তূলনা করি তাহলে দেখব বেদ যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান , প্রকৃতি , জীবাত্মা , আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আইন , সমাজব্যবস্থা সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ এক সমৃদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার সেখানে সনাতনধর্ম বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই গীতা থেকে বা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে উত্তর পাওয়া যায় না । পরমেশ্বর আমাদের বেদ বাণীর দান করেছে সমগ্রবিশ্বের জন্য , সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য , বিশেষ কোন জাতি বা ধর্মের জন্য নয় । বেদপাঠে সবার অধিকার রয়েছে । আপনারা সত্যের পথে ধাবিত হন । বেদ অধ্যায়ন করুন , কুসংস্কার থেকে সমাজকে রক্ষা করুন ।

বিভেদের সাতকাহন

দৃশ্যপট - ১

ব্যক্তি ১: সনাতন ধর্মে তো প্রচুর জাতিবৈষম্য বিদ্যমান, অস্পৃশ্যতা আছে । এই ধর্মে আমি কেন থাকবো ?

অলস: কে বলেছে ভাই আপনাকে এই কথা ? সনাতন ধর্মে দেখুন কতো সাম্যের কথা আছে[একগাদা লিংক ও কপিপেস্ট প্রসব]...

ব্যক্তি ১: তাই তো, তাহলে যদি জন্মভিত্তিক বর্ণ না হয়, অস্পৃশ্য না থাকে তবে আমি এক 'দাস' পদবীযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমি একটি কন্যাকে বিবাহ করতে চাই । সে অনার্স সম্পন্ন করেছে । করতে পারবো কি ? শ্রাদ্ধ কর্ম সেভাবে হবে কি ? নারী পূজা করতে পারবে কি?

অলস: দেখুন, এখানে আপনাকে বুঝতে হবে । এই যে জাতিভেদ এটা কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক, আমগাছের ফল যেমন জামগাছ দেয়না তেমনি আপনার ও তার বিবাহ হলে...

ব্যক্তি ১: ভাই, আম ও জাম দুটো তো আলাদা প্রজাতি বা Species। আমরা তো মানুষ মানে Homo sapiens.

অলস: আরে ভাই, আপনি বেশী জানেন আমাদের শাস্ত্রকারদের থেকে, তারা কত গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক এসব তত্ত্ব দিয়েছে । শ্রাদ্ধ অশৌচ হলো পুরাণ ও স্মার্তের জিনিস, আপনি জন্মগত শূদ্র আর পুরাণেও জন্মগতই প্রাধান্য।

তাই আপনি মানতে বাধ্য । নারীর বেদাধিকার নাই, বেদ মন্ত্রে ভাইব্রেশন হয় তারা তা সহ্য করতে পারেনা । আর আপনি কেন বিভেদ করতে চাচ্ছেন এসব না মেনে ? পরম্পরা মানুষ বুঝলেন..

ব্যক্তি ১: আপনার পরম্পরায় তো বেদে গোবধ, বাল্যবিবাহ, অশ্লীলতা, অচ্ছুৎ এসব আছে..

অলস: এইতো, এভাবেই তো শাস্ত্র না মেনে কলহ বিবাদ করতে চান, আরে ভাই এখন সময় হলো ঐক্যের । যদি হিন্দুই না থাকে এসব অধিকার সাম্যবাদ নিয়ে কী করবেন ?

ব্যক্তি ১: তাই তো, তা বলছি যদি এসব মানবাধিকার বা অমানুষিক বিধান থাকে তবে আদৌ হিন্দু থাকবে তো ? তারপর না ঐক্য বা সাম্যবাদ

অলস: এজন্যই তো আমরা কেবল সাকারবাদ বা এসব খণ্ডিতাংশ দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বিশাল হিন্দুত্ববাদী সাজি, এসব সামাজিক আন্দোলন করার সময় নেই, আমাদের গুরুর বিরুদ্ধে কেন যাবো?

ব্যক্তি ১: হ্যাঁ ঠিক তাই, এজন্যই এতো সংস্থা থাকা সত্ত্বেও যারা মানবিক তারাই এগিয়েছে কিন্তু ব্যাপক আকারে তা কার্যকর হয়নি আপনার মতো বিভেদ করবেন না বলে তার আড়ালে জাতিভেদ, কুসংস্কার টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের জন্য ।

দৃশ্যপট - ২

ব্যক্তি ২: সনাতন ধর্মে এতো নেশা - মদ - গাঁজা পূজায় দেয় এসব কোন কথা ? এটা আদৌ ধর্ম ?

অলস: আপনি ভুল জানেন, শাস্ত্রে এসব নেশার উল্লেখ নেই, দেখুন বেদে বলেছে নেশাকারী বিদ্বান পরিত্যাজ্য, সোম আসলে হলো ঔষধী ইত্যাদি ইত্যাদি

ব্যক্তি ২: তাহলে দাদা তান্ত্রিক পূজায় যে মদ দেওয়া হয় তা বন্ধ করা উচিত না ?

অলস: হায় হায়, এগুলো তো প্রবৃত্তিমার্গের অনুসারীদের জন্য, তারা একেবারে মদ ছাড়তে পারেনা তাই পূজা করে খায়, এতে লিমিটেশন দেওয়া আছে। আর গাঁজা তো ভালো জিনিস, জানেন না আয়ুর্বেদেও গাঁজার কতো উপকার লেখা আছে, আফসোস আপনারা তো পড়েন না আয়ুর্বেদ ।

ব্যক্তি ২: কিন্তু তা তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলো, আপনিই বললেন মদ সব নিষিদ্ধ। আর আয়ুর্বেদ তো দ্রব্যগুণ বর্ণনা করে, সেখানে তো মানুষের মূত্র, গোমাংসের গুণাবলীও আছে । তাও কি মানবো ?

অলস: এতো ভারি মুশকিল । আপনাকে এতো পড়াশোনা কে করতে বলেছে হ্যাঁ ? বিনা গুরু এসব গুহ্য জিনিস বোঝা যায় না, আসুন ঝোপের ধারে

ব্যক্তি ২: আপনার গুহ্য জিনিস ভাই আপনার গুহ্যদ্বারেই লুকায়িত রাখুন, কেউ মায়ের পেট থেকে মদ্যপ হয়ে আসে না । আর মন্দ কাজ মন্দই, পূজা সাত্ত্বিকতার নেয়, সেখানে তামসিক বিষয় অনুমোদন করাটা হলো বৈধতার ছলে অবৈধ কাজ করার অনুমোদন

অলস: এই তো, এভাবেই তো আপনারা পূজার বিরোধ করে সমাজে বিরোধ করছেন, বিভেদ করছেন । আরে ভাই আপনি বললেও যা হবে না বললেও এই মদ্যের ব্যবহার হবেই । আপনার মতো বিভেদকারীদের জন্যই হিন্দুর এই দশা

দৃশ্যপট - ৩

ব্যক্তি ৩: আচ্ছা মাংস খাওয়া যায় কি ?

অলস: বলি দিয়ে খাবেন, বেদে স্মৃতিতে তন্ত্রে আছে, না খাওয়া ভালো তবে নিবেদন করে খাবে যারা একেবারেই ছাড়তে পারেনা

ব্যক্তি ৩: কিন্তু শ্রৌতে, স্মার্তে তো বলি অন্যরকম যদি বলি মেনেও নেই, সেখানে শ্বাসরোধ করে পশুবধ আর তন্ত্রে এক কো পে । আর আপনি যে মুরগী খাচ্ছেন তা কোন যজ্ঞে দিচ্ছেন ? চিংড়ির মালাইকারী বা সর্ষে ইলিশ এসবও তো নিবেদন করে খান না, কেননা পিতৃব্যদের তো প্রচলিত মতে বৃহৎ মৎস্য দিতে হবে, আর আপনি তা করেনও না । খাসি খাচ্ছেন কিন্তু সে তো নপুংসক, বলিও হবে না ।

অলস: এই মশাই, আপনি তো দেখি বিভেদকারী, হিন্দুরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর আপনি কিনা এসব খাবারদাবারের কথা তুলে ধর্মকে রান্নাঘরে ঢুকাচ্ছেন ?

ব্যক্তি ৩: ধর্ম মানে তো মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রতিফলন । তাহলে তাতে আহার থাকবে না ? আর আপনার কথাও তো আপনি নিজেই মানেন না । তাহলে আপনার দ্বারা ধর্মের উন্নতি হবে কীভাবে ?

অলস: সেসব আপনার কাছে শিখবো না, আপনার মতো বিভেদকারীরাই বলি তুলে দিয়ে নপুংসক বানিয়েছে জাতিকে, যত্তোসব ।

ব্যক্তি ৩: হ্যাঁ, ৩-৪ জন মিলে নিরীহ পশুকে ধরে বলি দিয়ে বীরত্ব ? তা বলি শত্রুকে দমন নাকি এভাবে শেখেন, শত্রু কি এভাবে চতুষ্পদ অবলা জীব হয়ে আপনার হাড়িকাঠে এসে মাথা দিবে স্বেচ্ছায় ?

অলস: এই যান তো, নাহলে আপনাকেই বলি দিয়ে দেবো বলে দিলাম..

সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বেদ - বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্ [মনুস্মৃতি ২।৬]। শাস্ত্রে বারংবার বলা হয়েছে বেদানুকূল সিদ্ধান্তই ধর্ম ও তদ্বিরীত অধর্ম - "ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"[মনুস্মৃতি ২।১৩] অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায় তার জন্য বেদই মূখ্য প্রমাণ। সনাতন ধর্ম মৌলিক সিদ্ধান্তে স্বেচ্ছাচার করতে অনুমতি দেয় না । যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন -

য়ঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

[গীতা ১৬।২৩]

= যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না।

তাহলে প্রতিনিয়ত গীতার কথা শ্রবণ করেও যারা এই বাক্যে মনোনিবেশ করে না তাদেরকে জন্য ভগবান আরো স্পষ্ট করেই বলেছেন,

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

[গীতা ১৬।২৪]

= শাস্ত্রই প্রমাণ কর্তব্য ও অকর্তব্য কী হবে সেই বিষয়ে । অর্থাৎ আমার কী করা উচিত বা অনুমোদিত কিংবা কী করা অনুচিত বা নিষিদ্ধ তা আমাকে বলবে শাস্ত্র । এবং সেই শাস্ত্রবিধান জেনেই কর্ম করতে হবে ।

প্রতিটি বিষয়েই পর্যাপ্ত জ্ঞান কিংবা নিশ্চয়তা না থাকলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত দেওয়াতে অনধিকার চর্চা করা উচিত নয়। বৈদিক দর্শনে বলা হয়েছে -

"শ্রুতিবিরোধাত্রকুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ।"

[সাংখ্য দর্শন ৬।৩৪]

= বেদবিরোধী কুতর্কে আসক্তিযুক্ত পুরুষের আত্মতত্ত্ব লাভ হতে পারে না।

এভাবেই সনাতনী সমাজ ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। একেক গুরুর একেক মন্ত্র, একেক ঈশ্বর তত্ত্ব, একেক প্রথা ও সংস্কার দেখে ২% দীক্ষিত বাদে বাকি ৯৮% সাধারণ সনাতনী নিজ ধর্ম নিয়ে চরম বিভ্রান্ত। কোন উৎসব পালন করবে, কী খাবে, পশুবলি কি বিহিত নাকি অবিহিত, বর্ণ জন্মগত না কর্মগত, কাকে ও কীভাবে উপাসনা করবে, ঈশ্বর–জীব–প্রকৃতি তত্ত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক, কোন মন্ত্র জপ করবে সবাই এসব সাধারণ ব্যাপারেই তারা বিভ্রান্ত ও একক সিদ্ধান্তহীন। অথচ এসবই আমাদের তথা যে কোন ধর্মীয় সমাজের মূল ভিত্তি। যারা কিনা এসব ভিত্তিতে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দিয়ে এড়িয়ে যায় বা সবই ঠিক বলে তারাই মূলত বিভ্রান্তকারী শাস্ত্রব্যবসায়ী। যারা ঐক্যের কথা বলে তারা এটাই ভুলে যায় যে যদি মূলটাই ভিন্ন হয় তবে আপাত মধুর ঐক্যের রব কেবল শুনতেই ভালো লাগবে কিন্তু তা কখনোই বাস্তবে ফলপ্রসূ নয়। যদি দশজন সনাতনীকে ডেকে ঈশ্বরের নাম জিজ্ঞেস করা যায়, কেউ হয়তো বলবে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, শিব তার দাস। কেউ বলবে শিব ঈশ্বর কৃষ্ণ শিবের ভক্ত। কেউ বলবে মা দূর্গা বা শক্তি ই ঈশ্বর, বিষ্ণু, শিব এরা সবাই মায়ের সৃষ্টি। কেউ আবার নিজস্ব মতবাদের গুরুদের নাম বলবে ঈশ্বর হিসেবে। অবশ্যই আমাদের ধর্মে অনেক মহাপুরুষ এসেছেন, যারা নিজ নিজ মতে সাধনা করেছেন এবং সাধারণকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের মত যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এমনটা বলার সুযোগ নেই। একমাত্র ঈশ্বর বাদে কোনো মানবই শতভাগ অভ্রান্ত হতে পারে না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে একমাত্র অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ হলো বেদ। বেদ ব্যতীত বাকি সবাই পরতঃপ্রমাণ। তাই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী গুরুর শরণ আবশ্যক যিনি শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করবেন। সেই গুরুর কোনো কথা যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা সেই কথাটি বর্জন করব। গুরুকে ও গুরুর আদর্শকে তথা যেকোন কিছুকেই বেদের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করব।

সনাতনধর্মে নানা গুরুবাদী সম্প্রদায় বা নানা দেবোপাসক সম্প্রদায় নিজস্ব গ্রন্থ বা নিজস্ব পুরাণ রচনা করেছে যাতে সর্বদাই নিজ উপাস্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য অন্য দেবতাকে ছোট করে দেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এমন স্ববিরোধী গ্রন্থাদি বর্জন করে কেবল বেদের পথই অনুসরণ করা উচিত আমাদের। ধরি দুটো জায়গা, 'ক' এবং 'খ' বিন্দু। ক থেকে খ তে যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ একটাই, যা তাদের সরলরৈখিক দূরত্ব [পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ভেক্টর দূরত্ব]। অন্য যেকোনো পথ সরল পথের তুলনায় জটিল এবং দুরূহ। আবার কোনো কোনো পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার বদলে উল্টোদিকেও নিয়ে যেতে পারে। কাজেই "যত মত তত পথ" নয়, "বেদের পথই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ"। কাজেই এক মানবজাতি আর্য; এক ধর্ম বৈদিক সনাতন; এক মূল গ্রন্থ বেদ; এক মূল মন্ত্র, গায়ত্রী; এক উপাস্য, নিরাকার পরমাত্মা [ওঃম্] হলেই বহুমতের ফাঁদে বিভক্ত সনাতনী সমাজের মাঝে একতা আসবে। বৈদিক যুগে সমস্ত সমাজ এভাবেই একমত, একপথের একক সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাই বৈদিক ধর্মও ছিল অপরাজেয়। কালের আবর্তে পৌরাণিক যুগ আসার পর বেদের চর্চা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়,

ফলে আমরাও হারিয়ে ফেলি আমাদের গৌরবময় অতীত। দলে দলে পৌরাণিক জাতপাত, কুসংস্কারের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত হতে থাকে লক্ষ লক্ষ সনাতনী। আর একমাত্র বেদের একতার পথই পারে এসবের পুনরুদ্ধার ঘটাতে। মূলতঃ বিভেদের কথা বলে যারা সনাতন ধর্মকে শুদ্ধতম রূপে রাখতে দিচ্ছেন না তারাই সনাতন ধর্মের প্রকৃত শত্রু। কেননা মিথ্যার ভিত্তিতে কোন কিছু স্থায়ী হয়না। অনেকে বিধর্মীদের উদাহরণ দেবেন এখানে জানি, যে তাদেরটাও মিথ্যা তাও এগিয়েছে। প্রশ্ন হলো বিধর্মীদের থেকে নিজেদের উৎকৃষ্ট দাবি করে এভাবে নিকৃষ্ট বিষয়ে তুলনা করে নিজেদের দোষকে বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা কতটা ঠিক ? জাতিভেদ, আচারবিধি, খাদ্যাভ্যাস সবই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মান্তর বা নানাকাজে সারাদিন 'শাস্ত্র জানলে এমন হতো না' এসব বলে সেই শাস্ত্রকে অস্বীকার করা কেমন সততা ও নৈতিকতা ?

প্রকৃতপক্ষে যারা এসব বলে বিভেদের কথা তারা আসলে হয় বোকা-অলস নাহলে ব্যবসায়ী । বোকা-অলসরা বিরোধীতা করে কেনন ধর্মীয় বিধান মানতে হলে ধর্মের নামে নেশা-ভাং কিংবা কোন অশাস্ত্রীয় কাজ করতে পারবে না, আর ব্যবসায়ীদের আপত্তি এজন্য যে গুরুবাদ, অন্ধ পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাবে মানুষ যদি শাস্ত্র মেনে চলে। তাই দেখবেন, যতই কুসংস্কার থাকুক না কেন প্রতিবাদ কেবল ফেসবুকে ও বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ । না এরা কখনো শাস্ত্র চর্চা করে না ইতিহাস চর্চা করে। শাস্ত্র চর্চা করলেও সেটা একপাক্ষিক অর্থাৎ কেবল জনগণকে কিছু শ্লোক বাণী দিয়ে বুঝ দেওয়ার মতো। অন্যদিকে বিশাল সনাতনধর্ম সাহিত্য, বৈদিক শাস্ত্রের বাক্য তারা প্রচারও করে না, পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবেও প্রয়োগ করার চেষ্টা করে না বা উদ্যোগ নেই। কেননা সমাজকে সংশোধন করে ঐক্যমতে আনবে এমন কাজ করলে তো সস্তা খ্যাতি পাওয়া কিংবা যেমন খুশি তেমন কাজ করা সম্ভব না। সব থেকে হাস্যকর ব্যাপার হলো নিজেদের মতবাদ রাখতে শাস্ত্রকে ব্যবহার করবে কিন্তু যখন মানতে ও প্রচার করতে বলা হবে তখন বিভেদের কথা বলে পালাবে । এদের শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা অবশ্য কর্তব্য । এই প্রতিরোধ ধর্মের স্বার্থে, সনাতনীদের ঐক্য এই বাদে সম্ভব না । কেননা -

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ ।

তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ ॥

মনুস্মৃতি ৮.১৫

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধর্মকে বিনাশ করে, ধর্ম তাকেই বিনাশ করে । যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মও তাকে রক্ষা করে । এজন্য হত ধর্ম আমাকে যেন কখনও হত না করে- এই ভয়ে ধর্মকে কখনও হনন অর্থাৎ ত্যাগ করা উচিত নয় ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

উপাসনার আগে প্রাণায়াম কেন করা হয় ?

🔹 প্রাণায়াম - অষ্টাঙ্গযোগ ও আমাদের নিত্য সন্ধ্যোপসনার একটি অংশ।

শ্বাস- প্রশ্বাসের গতিকে যথাশক্তি নিরোধ করাকে **"প্রাণায়াম"** বলা হয়। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণবায়ুর নিরোধ, প্রাণ= প্রাণবায়ু, আয়াম=নিরোধ।

প্রাণায়ামের মাধ্যমে আত্মা ও মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা আসে। প্রাণায়ামে প্রথমত -'বাহ্যবিষয়', অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাহিরে নিরোধ করা; দ্বিতীয়-'আভ্যন্তর', অর্থাৎ প্রাণকে ভিতরে যতক্ষণ নিরোধ করা যায়, ততক্ষণ নিরোধ করা, তৃতীয়- 'স্তম্ভবৃত্তি' অর্থাৎ এক সঙ্গেই যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা; চতুর্থ-'বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী' অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হতে বহির্গত হতে থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে তাকে বাহির হতে না দিয়ে, বাহির হতে ভিতরে আনা। যখন প্রাণ বাহির হতে ভিতরে আসতে আরম্ভ করিবে, তখন তাকে ভিতর হতে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া রোধ করতে থাকা।

" এই চারপ্রকার প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্মল হয়ে উপাসনায় স্থির থাকে।**"**

~ ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, উপাসনাবিষয়

🔸যোগদর্শনে মহর্ষি কপিল বলছেন,

"যোগাঙ্গানুষ্টানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতৈঃ।" (যোগ ২।২৮।।)

অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় এবং অশুদ্ধি ক্ষয়ে বিবেকখ্যাতি (তত্ত্বজ্ঞান) পর্যন্ত জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

প্রাণায়ামের ফলে আমাদের দেহে বায়ু হতে অক্সিজেন আমাদের রক্তে মিশে আমাদের রক্তকে শুদ্ধ করে, শুদ্ধ রক্ত হৃদয়ে পৌছে ধমনি সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় এবং নিঃশ্বাসের দ্বারা অশুদ্ধ বায়ু বের হয়ে যায়। প্রাণায়াম যেমন শারীরিক উন্নতি ঘটায় তেমনি আমাদের মানসিক উন্নতিও সাধিত করে।

🔹যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি আরো বলেছেন

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। - (যোগ০ ২।৫২)" ~প্রাণায়ামের দ্বারাই জ্ঞানের আবরণরূপ 'অজ্ঞানতা' ক্ষীণ হয়ে যায় ॥

গীতা ৪।২৯ নং শ্লোকেও আমরা প্রাণায়ামের উল্লেখ পাই, "অপানে জুহূতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে। প্রাণাপানগতি রুদ্ধা প্রাণায়ামপরাযণাঃ।"

~ গীতা ৪।২৯

"অপর যোগিগণ প্রাণ ও অপানের গতিকেরুদ্ধ করিয়া, প্রাণায়াম পরায়ণ হন, আবার অপানে প্রাণের হবন করিয়া থাকেন। এইভাবে প্রাণে-অপানের হবন করিয়া অর্থাৎ রেচক=[প্রাণকে বাহিরে বর্জন করা], পুরক=[প্রাণকে ভিতরে গ্রহণ করা] ও কুম্ভক= [নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাইরে দম আটকে রাখা অথবা শ্বাস গ্রহণ করে ভিতরে দম আটকে রাখা] এই অবয়বত্রয়ে বিভক্ত প্রাণায়াম্যে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।"

এছাড়াও প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে মহর্ষি উল্লেখ করেছেন, “ যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণে উত্তরোত্তর কালে অশুদ্ধির নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে। যে পর্যন্ত মুক্তি না হয় সেই পর্যন্ত আত্মার জ্ঞান নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।” ~ সত্যার্থ প্রকাশ তৃতীয় সমুল্লাস।

▪ “ যেমন অগ্নিতে তপ্ত করিলে সুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হওয়ায় উহা শুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম করিলে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ ক্ষীণ-দোষ হইয়া নির্মল হইয়া থাকে।” ~ সত্যার্থ প্রকাশ তৃতীয় সমুল্লাস।

“ প্রাণায়ামের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ও স্বাধীন হয়। বল এবং পুরুষকার বৃদ্ধি *প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হয়, যাহার ফলে অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে মানব শরীরে বীর্যবৃদ্ধির ফলে স্থৈর্য, বল, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্প কালের মধ্যেই সকল শাস্ত্র বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য জন্মে।”
~ সত্যার্থ প্রকাশ তৃতীয় সমুল্লাস

নারী, পুরুষ উভয়ের জন্যই যোগাভ্যাস করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

🔷য়া প্রাণেন সংভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত, এতদ্বৈ তৎ॥

~ কঠোপনিষদ ২।১।৭

অর্থাৎ, যে অবিনাশী দিব্যসুখপ্রদ উপাস্য পরমাত্মা প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়ার ফলে হৃদয়াকাশে প্রকট হন এবং হৃদয়রূপী গুহাতে প্রবেশ করে যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনি ভূতসমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত হন। ইনিই সেই ব্রহ্ম ॥৭॥

এখানেও আমরা স্পষ্টভাবে প্রাণায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। আবার একইভাবে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে,

🔶প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।

দুষ্টাশ্বয়ুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥

~ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ২।৯

অর্থাৎ, যোগীপুরুষ এই যোগাভ্যাসের সময় চেষ্টাযুক্ত হয়ে প্রাণবায়ুকে ভেতরে টেনে এবং রুদ্ধ করে, প্রাণবায়ু সূক্ষ্ম হওয়ার পর নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বাইরে নিষ্কাশিত করবে। যেরূপ রথে যুক্ত অবাধ্য অশ্বকে বশ করা হয়, তদ্রূপ প্রমাদ রহিত বিদ্বান ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা নিজের মনকে বশ করবে।

সোমনাথ মন্দিরে কি আসলেই কোন মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিলো?

- 'শেষ জামানার ফিতনা' বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের জবাব

বইটিতে সুলতান গজনবী কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ভাঙার ইতিহাস ও কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে,

“ ভগবানের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা কুমারী মেয়েকে দেবতার সামনে ধর্ষণ করে বলি দিত। তখনকার উগ্র হিন্দুবাদী সোমনাথের পুরোহিতরা একটি মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে বলি দেওয়ার চেষ্টা করলে সেই মেয়েটি আপন সতিত্ব রক্ষার জন্য মন্দিরের কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। গজনবি তখন গজনিতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইমানি জোশে অস্থির হয়ে ওঠেন। মুসলিম বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্যই ষড়যন্ত্রের আখড়াকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শপথ নেন।

দাদারা, তোমরা তোমাদের ধর্মীয় প্রার্থনা করো; তাতে তো কোনো সমস্যা ছিল না। তোমাদের মেয়েদের তোমরা ইচ্ছামতো ধর্ষণ করে মন্দিরে বলি দিলে গজনবির তাতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু প্রার্থনার নামে কেন মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করতে গেল তোমাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র পূর্বসূরিরা? দোষটা কার-তোমাদের নাকি তাঁর? একজন মুসলিম বোনকে ধর্ষণ করে হত্যা করবে আর তাঁর মতো আত্মপ্রত্যয়ী আত্মমর্যাদার অধিকারী সুলতান বসে বসে আঙুল চুষবেন, এটা তোমরা ভাবো কীভাবে? তোমরা কি বর্তমান মুসলিম উম্মাহের ওপর গজনবিকে বিচার করো? তিনি তো ছিলেন এমন এক আত্মমর্যাদাবান সুলতান, এহেন অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য তাঁর সালতানাত বিসর্জন দিতে হলেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।”

🔴সমীক্ষা:

উক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা । আমরা সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি উক্ত কাহিনীর সপক্ষে যদি তাদের ক্ষমতা থাকে তবে কোন ঐতিহাসিক দস্তাবেজ বা প্রমাণ উপস্থাপন করুক । তাদের সম্পূর্ণ আয়ুস্কাল অব্দি সময় দিলাম আমরা । আরো বিবেচ্য -

১. বইটির লেখকরা সুপরিচিত বক্তা । এমন একটি বক্তব্য তারা কীভাবে নির্দ্বিধায় প্রমাণ ছাড়াই লিখে ফেললেন ?

২. বইটিতে 'দাদা' বলে হিন্দু নির্দেশ করে কটাক্ষ করে অপমন্তব্য ও মিথ্যাচার করা কী ধরনের নৈতিক শিক্ষা ?

৩. তথ্যসূত্র উল্লেখ তো তারা করেনইনি, উলটো ছত্রেছত্রে যে সনাতন ধর্ম সম্পর্কে তারা কটূক্তি করেছেন এটাই কি ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা আপনাদের পক্ষ থেকে ?

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরাও কম যায়নি, এমনই এক লেখিকা গার্গী চক্রবর্তী বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসকে নৈতিক সমর্থন দিতে একটি কাহিনী লেখেন, যাতে বলেন কচ্ছের মহারাণী নাকি মন্দিরে ধর্ষিত হন, সমস্ত রাজারা মন্দির অপবিত্র হওয়া দেখে আওরঙ্গজেবকে অনুরোধ করেন ব্যবস্থা নিতে । ঔরঙ্গজেব আদেশ দিলেন, পবিত্র

দেবাঙ্গন যেহেতু কলুষিত হয়েছে, অতএব প্রভু বিশ্বনাথকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হোক। মন্দির ভূমিস্যাৎ করা হোক। আর মহান্তকে বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হোক।

গার্গী চক্রবর্তী তথ্যসূত্র হিসেবে যার নাম লিখেছেন সেই বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে তাঁর গল্পের তথ্যসূত্র হিসাবে লিখেছেন, ড. পট্টভি সীতারামাইয়া প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Feathers and the Stones এ এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য এমনতর ঘটনার কোনও প্রামাণ্য দলিল নেই। পট্টভি সীতারামাইয়া কংগ্রেসী রাজনীতিবিদ এবং স্বভাবতই মিথ্যুক। তাঁর বইয়ের নাম, Feathers and Stones. বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে তাঁর বই লেখার সময় হাতের কাছে সীতারামাইয়ার বই ছিল না। ফলে বইটার ভুল নাম দিয়েছেন। সীতারামাইয়ার তথাকথিত প্রামাণ্য দলিলটা হচ্ছে, "This story of Beneras Musjid was given in a rare manuscript in Lucknow which was in the possession of a respected Mulla who had read it in the Ms. and who though he promised to look it up and gave the Ms. to a friend, to whom he had narrated the story, died without fulfilling his promise."।

বোঝাই যাচ্ছে, সীতারামাইয়া কোনও প্রাচীন পুঁথি দেখেন নি; তিনি শুধুমাত্র অন্যের মুখের কথা বিশ্বাস করে স্মৃতিকথাতে ঔরঙ্গজেবকে বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কারণ, সনাতন বিরোধীদের তৈল প্রদান করাটাই এদের জিনগত ব্যাধি। আর মিথ্যার নর্দমায় মুখ রেখে চলা কমিউনিষ্ট গার্গী চক্রবর্তী মিথ্যুক বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডের ছাপা লেখাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন।

আওরঙ্গজেবের ইতিহাস চর্চা করে খুঁজে দেখেননি, আওরঙ্গজেব জীবনে কোনও দিন বাংলার দিকে এসেছিলেন কি না। আর সীতারামাইয়া কচ্ছের রাণীকে ধর্ষণের কথা লেখেন নি; তাঁর গহনা কেড়ে নেওয়ার কথাই শুধু লিখেছেন। আর আমাদের এই বাংলার আর এক বামী জোচ্চোর স্রেফ পাণ্ডের বই থেকে টুকলী করে দাঙ্গার একটা ইতিহাস বইয়ে কচ্ছের রাণীর ধর্ষণের গল্প ছেড়েছেন। কতবড় তঞ্চক এই পদ্ম পুরস্কার প্রাপ্ত তা চিন্তা করুন।

অতএব ইতিহাস সম্পর্কে জানুন, অন্যকে জানান । আপনি সচেতন না হলেও অপপ্রচার থেমে নেই । এ ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা নেয় না তার ব্যক্তিত্ব নেই, ভবিষ্যতও নেই । নতুবা অনুতাপ যখন হবে তখন আর কিছুই করার থাকবে না ।

📌 শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ বিভাগ

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের দৃষ্টিতে বংশমর্যাদার মাপকাঠি

আমাদের সমাজে বংশমর্যাদা একটি অতি পরিচিত ধারণা। কারণ সমাজে বংশ পরিচয় ও বংশমর্যাদাকে একজন মানুষের পরিচয় এবং চরিত্র বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এবং বলা বাহুল্য যে, আমাদের জড়বাদী এই সমাজের বংশমর্যাদা নির্ধারিত হয় মুখ্যত ব্যক্তির পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা, পিতা-পিতামহের অর্জিত সুনাম/দুর্নাম, ধন-সম্পদের পরিমাণ, রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি, পেশাগত মান এবং তথাকথিত উচ্চ জাতিবাদী ধারণা ইত্যাদির ভিত্তিতে।

কিন্তু আপনি কি জানেন, মহাভারতকালীন বৈদিক সমাজে বংশমর্যাদা কিভাবে নির্ধারিত হতো? এবং সেই সমাজে কেমন কুলকে শ্রেষ্ঠ বলা হতো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা আধুনিক যুগের এই পরিচিত জড়বাদী ধারণার চেয়ে ভিন্ন ; একটি উন্নত এবং ব্যাতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হবো, যেখানে একটি কুল বা বংশের মর্যাদা নির্ভর করত সম্পূর্ণ এর সদস্যদের গুণাবলীর উপর; যেখানে ধর্ম, সদাচার, উত্তম কর্ম, এবং নৈতিকতা ছিল একটি বংশের মর্যাদার মুখ্য মাপকাঠি।

আসুন, জেনে নিই কীভাবে মহাভারতকালীন সমাজে বংশমর্যাদা নির্ধারিত হত এবং বৈদিক সমাজব্যবস্থায় কেমন কুলকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়?

🔹 মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ৩২-৩৯ তম অধ্যায়গুলো বিদুরনীতি নামে পরিচিত। এ পর্বের ৩৫ তম অধ্যায়ে বা বিদুরনীতির চতুর্থ অধ্যায়ে হস্তিনাপুরসম্রাট মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় মহামন্ত্রী বিদুরের কাছ থেকে সদ্বংশের গুণাবলী শ্রবণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন,

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

মহাকুলেভ্যঃ স্পৃহয়ন্তি দেবা ধর্মার্থনিত্যাশ্চ বহুশ্রুতাশ্চ ।

পৃচ্ছামি ত্বাং বিদুর প্রশ্নমেতং ভবন্তি বৈ কানি মহাকুলানি ॥৪/২২॥

📖 অর্থাৎ- ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে বিদুর, ধর্মকার্য ও অর্থ উপার্জনে তৎপর , বহু শাস্ত্রের জ্ঞাতা, নিষ্কাম বিদ্বানগণও সর্বদা শ্রেষ্ঠ কুল বা বংশে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতএব হে বিদুর! তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে, কোন বংশকে মহাকুল বলা যায়?

🔹 রাজার প্রশ্নের উত্তরে মহামতি বিদুর বললেন,

বিদুর উবাচ

তপো দমো ব্রহ্মবিত্তং বিতানাঃ

পুণ্যা বিবাহাঃ সততান্নদানম্ ।

যেষ্বেবৈতে সপ্ত গুণা বসন্তি

সম্যগ্বৃত্তাস্তানি মহাকুলানি ॥২৩॥

📖 অর্থাৎ- তপস্যা, আত্মসংযম, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুযায়ী পবিত্র বিবাহ, নিরন্তর অন্নদান এবং উত্তম আচরণ—এই সাতটি গুণ যার মধ্যে বাস করে, তাকেই মহাকুল বা শ্রেষ্ঠ বংশ বলা হয়। (২৩)

যেষাং হি বৃত্তং ব্যথতে ন যোনিশ্

চিত্তপ্রসাদেন চরন্তি ধর্মম্ ।

যে কীর্তিমিচ্ছন্তি কুলে বিশিষ্টাং

ত্যক্তানৃতাস্তানি মহাকুলানি ॥২৪॥

📖 অর্থাৎ- যে সব বংশসমূহ কখনো সদাচার হতে বিচ্যুত হয় না, যেখানে মাতাপিতা আদি গুরুজনেরা কখনো কষ্ট পান না, যেখানে পরিবারের সদস্যরা আনন্দচিত্তে ধর্মাচরণ করেন, যারা নিজেদের বংশের বিশেষ সুনাম বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যারা মিথ্যা বাক্য বলা ও মিথ্যাচার করা পরিত্যাগ করেছেন, সেই সব বংশই মহাকুল বা শ্রেষ্ঠ বংশ বলে গণ্য হয়। (২৪)

অনিজ্যযা কুবিবাহৈর্বেদস্যোৎসাদনেন চ ।

কুলান্যকুলতাং যান্তি ধর্মস্যাতিক্রমেণ চ ॥২৫॥

📖 অর্থাৎ- ব্রহ্মযজ্ঞ আদি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করা, নিন্দিত বিবাহ সম্পন্ন করা, বেদ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করা এবং ধর্মের লঙ্ঘন করা—এই কারণে উত্তম বংশও নীচ বংশে পরিণত হয়। (২৫)

দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ ।

কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥২৬॥

📖 অর্থাৎ- যজ্ঞ, বিদ্বানদের সেবা অথবা জনসাধারণের কাজের জন্য সংগৃহীত সম্পদের অপব্যবহার করার ফলে, বিদ্বান ব্রাহ্মণদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাদের অসম্মান করার কারণে বংশসমূহ নীচ বংশে পরিণত হয়। (২৬)

ব্রাহ্মণানাং পরিভবাৎপরিবাদাচ্চ ভারত ।

কুলান্যকুলতাং যান্তি ন্যাসাপহরণেন চ ॥২৭॥

📖 অর্থাৎ- হে ভরত বংশোদ্ভূত ধৃতরাষ্ট্র! ব্রাহ্মণদের দমন করা, তাদের ওপর অত্যাচার করা, তাদের নিন্দা করা এবং তাদের গচ্ছিত সম্পদ আত্মসাৎ করার ফলে একটি বংশ নীচ বংশে পরিণত হয়। (২৭)

কুলানি সমুপেতানি গোভিঃ পুরুষতোঽর্থতঃ ।

কুলসঙ্খ্যাং ন গচ্ছন্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ ॥২৮॥

বৃত্ততস্ত্ববিহীনানি কুলান্যল্পধনান্যপি ।

কুলসঙ্খ্যাং চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্যশঃ ॥২৯॥

📖 অর্থাৎ- যে সমস্ত বংশ চারিত্রিকভাবে নীচ, তারা গো, মনুষ্য এবং বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ বংশের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যারা সদ্গুণসম্পন্ন, তাঁরা কম সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হলেও শ্রেষ্ঠ বংশ বলে গণ্য হন এবং মহান খ্যাতি অর্জন করেন। (২৮, ২৯)

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্বিত্তমেতি চ যাতি চ ।

অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥৩০॥

গোভিঃ পশুভিরশ্বৈশ্চ কৃষ্যা চ সুসমৃদ্ধয়া ।

কুলানি ন প্ররোহন্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ ॥৩১॥

মা নঃ কুলে বৈরকৃৎ কশ্চিদস্তু

রাজাঽমাত্যো মা পরস্বাপহারী ।

মিত্রদ্রোহী নৈষ্কৃতিকোঽনৃতী বা

পূর্বাশী বা পিতৃদেবাতিথিভ্যঃ ॥৩২॥

📖 অর্থাৎ- বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য সদাচারই প্রধান, তাই বিশেষ যত্নসহকারে সদাচারের রক্ষা করা উচিত। ধন-সম্পত্তি তো আসতে ও যেতে থাকে, তাই ধনহীন ব্যক্তি দরিদ্র নয়, কিন্তু ধর্মযুক্ত সদাচারহীন ব্যক্তি আসলেই দরিদ্র বা মৃতের সমান। ধনের চেয়ে সদাচার শ্রেষ্ঠ, তাই একে সর্বথা রক্ষা করা উচিত। (৩০) যে বংশ সদাচার বিমুখ, তারা গো-অশ্বাদি পশু, কৃষিক্ষেত্র এবং প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও শ্রেষ্ঠ বংশের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। (৩১) সজ্জনরা এইরকম কামনা ও প্রার্থনা করেন যে আমাদের বংশে কেউ শত্রুতা সৃষ্টি করার মতো না হোক, রাজা ও মন্ত্রী যেন অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন না করেন, আমাদের পরিবারে যেন কেউ বিশ্বাসঘাতক, অসৎ, মিথ্যাবাদী এবং পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও অতিথিযজ্ঞ করার আগে ভোজনকারী না হয়। (৩২)

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা ।

সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥৩৪॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন্নুপনীতানি সৎকৃতিম্ ।

প্রবৃত্তানি মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মিণাং পুণ্যকর্মিণাম্ ॥৩৫॥

📖 অর্থাৎ- সজ্জনদের গৃহে অতিথি সেবার নিমিত্তে বসার জন্য তৃণের আসন, শোবার জন্য ভূমি, পানীয় জলের জন্য শীতল জল এবং মধুর ও সত্যবাণী—এই চারটি বস্তু সর্বদা বিদ্যমান থাকে। হে মহাবুদ্ধিমান রাজন! সজ্জনদের গৃহে ধর্মপরায়ণ, পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য তৃণের আসনসহ উপরোক্ত চারটি বস্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়। (৩৪,৩৫)

🔷 নিষ্কর্ষ 🔷

মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে যেভাবে শ্রেষ্ঠ বংশের পরিচয় দিয়েছেন; তদনুসারে বংশের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল জন্ম , অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও কতগুলি জড়বাদী শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং কিছু বিশেষ গুণ ও আচরণই বংশ বা কুলের শ্রেষ্ঠত্বের নির্ণায়ক।

📌 শ্রেষ্ঠ বংশের সাতটি গুণ-

১. তপস্যা: আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

২. আত্মসংযম: কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ।

৩. বেদাধ্যয়ন: বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন যথাযথরূপে করা।

৪. যজ্ঞানুষ্ঠান পালন: পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করা।

৫. গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুযায়ী পবিত্র বিবাহ: সঠিক বয়সে গুণবান পাত্র/পাত্রীর সাথে শাস্ত্রসম্মত ও সামাজিকভাবে বিবাহ করা।

৬. নিরন্তর অন্নদান: সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করতে কার্পণ্য না করা।

৭. সদাচার: সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

যে পরিবারে এই সাতটি গুণ বিদ্যমান, সেই পরিবারই প্রকৃত অর্থে মহাকুল বা শ্রেষ্ঠ বংশ।

📌 শ্রেষ্ঠ বংশের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য:

৮. সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা ও মিথ্যাচার পরিহার করা।

৯. পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাঁদের সেবা করা।

১০. ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

১১. নিজেদের পূর্বপুরুষদের সম্মান বজায় রাখা।

১২. মিথ্যা কথা ও অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকা।

১৩. অতিথিপরায়ণতা বা অতিথির সেবা করা।

📌 যেসব কারণে একটি বংশ অধঃপতিত হয়:

✅ বেদ অধ্যয়ন ত্যাগ করা।

✅ বেদবিহিত ব্রহ্মযজ্ঞ আদি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করা।

✅ নিন্দিত বিবাহ করা (গুরুজনের অসম্মতিতে পালিয়ে বিয়ে করা, ব্যাভিচার ইত্যাদি)

✅ ধর্মের লঙ্ঘন করা।

✅ ব্রাহ্মণদের (বিদ্বান ও সজ্জন) প্রতি অত্যাচার করা।

✅ ব্রাহ্মণ বিদ্বানদের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

✅ দুর্নীতি করা

✅ আচারভ্রষ্ট হওয়া। ইত্যাদি।

মহাত্মা বিদুরের বচনসমূহ পর্যালোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, প্রকৃত উচ্চবংশীয় ও অভিজাত তারাই, যারা বৈদিক ধর্মের অনুসারী এবং বেদ অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। অর্থাৎ, সদাচার, স্বাধ্যায়, যজ্ঞপরায়ণতা, পিতামাতার সেবা, দুর্নীতিমুক্ত জীবন, দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার মতো মহৎ গুণাবলি যাঁদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁরা যদি দরিদ্র হন তথাপি আর্যসভ্যতা তাঁদের উচ্চ সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। এবং বিপরীত দুর্গুণসমূহ ধারণকারী কুলসমূহকে নীচ কুল বলা হয় এবং প্রভূত ধনসম্পদশালী হলেও আর্যগণ এসমস্ত বংশকে সম্মান প্রদান করেন না।

সন্দর্ভ-

বিদুরনীতি [স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সরস্বতী]

বিদুরনীতি [স্বামী বেদানন্দ তীর্থ]

মহাভারত [শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত]

বৈদিক সরস্বতী- ব্রহ্মতত্ত্ব [বসন্তপঞ্চমী পালনপদ্ধতিসহ]

পরমেশ্বরের অসংখ্য নাম রয়েছে । যদিও তাঁর মুখ্য নাম ওঽম্, কিন্তু গুণবাচক নাম অসংখ্য । কারণ পরমেশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বভাব যেমন অনন্ত, তাঁর নামও তেমন অনন্ত। সে সকলের প্রত্যেকটির গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুসারে এক একটি নাম হয়েছে। এসবের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের দ্বারা বোধ হওয়া সম্ভব। আর যারা বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাদের অন্যান্য পদার্থের জ্ঞানও সম্পূর্ণ হতে পারে। তেমনই পরমেশ্বরের একটি গুণবাচিক নাম হলো ' সরস্বতী' । সরস্বতী শব্দটি এভাবে এসেছে,

(সৃ গতৌ) এই ধাতু [ধা০ ১.৬৬৯]থেকে ‘সরস্’ এবং এর উত্তরে ‘মতুপ্’ ও ‘ঙীপ্’ প্রত্যয় যোগে ‘সরস্বতী’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা সরস্বতী’= যাঁর বিবিধ বিজ্ঞান, শব্দ-অর্থ-সম্বন্ধ-প্রয়োগ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান আছে, সেই পরমেশ্বরের নাম ‘সরস্বতী’।

আমাদের শাস্ত্রে সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

ন চ স্ত্রী ন পুমাংশ্চৈব তথৈব ন নপুংসকঃ।

কেবলজ্ঞানমাত্রং তত্তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।।

[মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২১৮|৯০]

ঈশ্বর স্ত্রীও না, পুরুষও না এবং নপুংসকও না। তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র, তাঁরই মধ্যে এই সমস্ত জগত প্রতিষ্ঠিত।

এই জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরই সরস্বতী। এছাড়া প্রয়োগভেদে জ্ঞান, বেদবাণীসহ আরো বিভিন্ন অর্থে "সরস্বতী" শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

★চো॒দ॒য়ি॒ত্রী সূনৃ॑তা॒না॒ং চেত॑ন্তী সুমতী॒নাম্। য॒জ্ঞং দ॑ধে॒ সর॑স্বতী॥

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী।।

[ঋগ্বেদ১|৩|১১]

(সূনৃতানাং) সত্য ও প্রিয় বানীর (চোদয়িত্রী) প্রেরণাদাত্রী, (সুমতীনাম্) সৎ বুদ্ধির (চেতন্তী) চেতনা দাত্রী (সরস্বতী) জ্ঞানস্বরূপ পরেমেশ্বর (যজ্ঞম্) শুভ কর্মকে (দধে) ধারণ করে আছেন।

★ম॒হো অর্ণ॒ঃ সর॑স্বতী॒ প্র চে॑তয়তি কে॒তুনা॑। ধিয়ো॒ বিশ্বা॒ বি রা॑জতি॥

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতযতি কেতুনা।ধিযো বিশ্বা বি রাজতি।।

[ঋগ্বেদ১|৩|১২]

(সরস্বতী) জ্ঞানস্বরূপ পরেমেশ্বর (কেতুনা) শুভ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা (মহঃ অর্ণ) জ্ঞানের মহাপ্রবাহকে (প্রচেতয়তি) প্রকাশ করেন এবং (বিশ্বা ধিয়ঃ) সমস্ত ধারণাবতী বুদ্ধিকে (বি রাজতি) দীপ্তি দান করেন।

বৈদিক তত্ত্বে পরব্রহ্মই সরস্বতী । স্মার্ত ও পৌরাণিক মতে সরস্বতী ব্রহ্ম নয়, স্বতন্ত্র দেবী বিশেষ । তাই এই বিষয়ে আমাদের উচিত স্পষ্ট থাকা ।

পবিত্র বেদে সরস্বতী নাম্নী পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে -

সর॑স্বত্যভি নো॑ নেষি॒ বস্যো॒ মাপ॑ স্ফরী॒: পয়॑সা॒ মা ন॒ আ ধ॑ক্ ।
জু॒ষস্ব॑ নঃ স॒খ্যা বে॒শ্যা॑ চ॒ মা ত্বৎক্ষে॒ত্রা॒ণ্যর॑ণানি গন্ম ॥
ঋগ্বেদ ৬।৬১।১৪

হে প্রভু ! তুমি আমাদের প্রশস্ত সম্পদ লাভ করাও। আমাদের অনগ্রসর কোরো না। স্বীয় জ্ঞানধারা দ্বারা আমাদের বাসনাগ্নিতে জ্বলতে দিও না, নির্বাপিত করো। হে প্রভু! আমাদের বন্ধুত্ব ও কর্ম প্রেমপূর্বক স্বীকার করো। আমরা যেন তোমাকে ছেড়ে দুঃখদায়ক ক্ষেত্র বা দেহ লাভ না করি ।

ভ॒দ্রমিদ্ভ॒দ্রা কৃ॑ণবৎসর॑স্বত্যক॑বারী চেততি বা॒জিনী॑বতী ।
গৃ॒ণা॒না জ॑মদগ্নি॒বৎস্তু॑বা॒না চ॑ বসিষ্ঠ॒বৎ ॥
ঋগ্বেদ ৭।৯৬।৩

সর্বকল্যাণত্রী সেই পরমেশ্বরী ঐশ্বর্য, অন্নাদি, সূর্যাদি জগৎ স্বামিনী ! বিদ্বানগণে অধিকারিণী ! সেই পরমেশ্বরী আমাদের কুৎসিত পথে যেতে না দিয়ে কল্যাণই করে । সবার জ্ঞানদাত্রীও তিনিই । তিনিই প্রকাশস্বরূপ, স্তুত্য; সর্ব নিবাসকরূপে সকলের স্তুতিযোগ্যা ।

সর॑স্বতীং দেব॒য়ন্তো॑ হবন্তে॒ সর॑স্বতীমধ্ব॒রে তা॒য়মা॑নে ।
সর॑স্বতীং সু॒কৃতো॑ অহ্বয়ন্ত॒ সর॑স্বতী দা॒শুষে॒ বার্যং॑ দাৎ ॥
ঋগ্বেদ ১০।১৭।৭

পরমেশ্বর লাভে নিরত বিদ্বানগণ জ্ঞানপ্রকাশ প্রদাত্রী , পরমসুখদাত্রী পরমেশ্বরকে সর্বপ্রশস্ত জ্ঞানসম্পন্না সত্ত্বারূপে স্বীকার করেন এবং যজ্ঞ বিস্তারপূর্বক জ্ঞানময় বেদবাণীর ন্যায় সেই প্রভুকে স্মরণ করেন । সুকৃতিকারী পুণ্যাত্মাগণ সেই জ্ঞানময় বেদবাণী ও প্রভুকেই প্রার্থনা করেন । কেননা সেই উত্তম জ্ঞানাধিকারিণী প্রভুই আত্মসমর্পক, দাতা, ত্যাগী মানবকে বরণীয় উত্তম জ্ঞান-সম্পদ প্রদান করেন।

সর॑স্বতি দেব॒নিদো॒ নি ব॑র্হয় প্র॒জাং বিশ্ব॑স্য বৃ॒সয়॑স্য মা॒য়িন॑: ।
উ॒ত ক্ষি॒তিভ্যো॒হবনী॑রবিন্দো॒ বি॒ষমে॑ভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥
ঋগ্বেদ ৬।৬১।৩

হে জ্ঞানদাত্রী ! তুমি দিব্যভাব বিরুদ্ধ নিন্দনীয় ভাবকে বিনষ্ট করো, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আবরণভূত কামনা-বাসনার প্রাদুর্ভাব দূর করো। হে পরমেশ্বরী ! আসুরভাবে আক্রান্ত পঞ্চকোশকে পবিত্র করে আমাদের দাও । হে সর্ববলপ্রদাত্রী ! তুমি মানুষের জীবনের বিষাক্ততাকে দূর করো, তাকে অমৃতময় করো ।

বসন্ত পঞ্চমী

এই কালকে 'কাম'সূচক বলক হয় । বেদে ও গীতায় বৈধ কাম অনুমোদিত । মহর্ষি মনু স্বীয় স্মৃতিতে কামকে সমস্ত ক্রিয়ার মূল বলে বর্ণনা করেছেন । বসন্তী পঞ্চমীতে মেধাকামনা করে পৌরাণিকমতে সরস্বতীপূজার অর্বাচীন বিধান দৃষ্ট হয় । বৈদিক বিধান অনুযায়ী এ অবস্থায় পালনীয় নিম্নরূপ -

- পদ্ধতিঃ পূর্ণাহুতির পূর্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি -

ওঽম্ বসন্তেন ঋতুনা দেবা বসবস্ত্রিবৃতা স্তুতাঃ।
রথন্তরেণ তেজসা হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ স্বাহা॥১॥ [যজুর্বেদ ২১।২৩]
ওঽম্ মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতূ অগ্নেরন্তঃ শ্লেষোঽসি কল্পেতাং দ্যাবাপৃথিবী কল্পন্তামাপ ওষধয়: কল্পন্তামগ্নয়: পৃথগ্ভ্যম জ্যৈষ্ঠ্যায় সব্রতাঃ । যে অগ্নয়: সমনসোঽন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে । বাসন্তিকাবৃতূ অভিকল্পমানা ইন্দ্রমিব দেবা অভিসংবিশন্তু তয়া দেবতয়াঽঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবে সীদতম্ স্বাহা ॥২॥
ওঽম্ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ স্বাহা ॥৩॥
ওঽম্ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবꣳ রজ: । মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা স্বাহা ॥৪॥
ওঽম্ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য: । মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ স্বাহা ॥৫॥ [যজুর্বেদ ১৩।২৫,২৭-২৯]

- মেধা কামনায় কেউ চাইলে এরপরে বেদোক্ত মেধাসূক্ত বা সরস্বতী দেবতাবাচক মন্ত্রে আদিতে ওঽম্ ও অন্তে স্বাহা যোগে রূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগে আহুতি প্রদান করতে পারে । সরস্বতী দেবতাবাচক মন্ত্রের সংগ্রহ -

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী ।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ঋগ্বেদ ১.৩.১০
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং ।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ঋগ্বেদ ১.৩.১১
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা ।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥ ঋগ্বেদ ১.৩.১২
যস্তে স্তন: শশয়ো যো মযোভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি ।
যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্র: সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ॥ ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৯
অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি ।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি ॥ ঋগ্বেদ ২.৪১.১৬
ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্ ।

শুনহোত্রেষু মৎস্ব প্রজাং দেবি দিদিড্‌ঢি নঃ ॥ ঋগ্বেদ ২.৪১.১৭
ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুষস্ব বাজিনীবতি ।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি প্রিয়া দেবেষু জুহ্বতি ॥ ঋগ্বেদ ২.৪১.১৮
একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ঋগ্বেদ ৭.৯৫.২
আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞম্ ।
হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু ॥ ঋগ্বেদ ৫.৪৩.১১
পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ ।
গ্নাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষং গৃণতে শর্ম যংসৎ ॥ ঋগ্বেদ ৬.৪৯.৭
ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে ।
যা শশ্বন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি ॥১
ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিষেভির্ঊর্মিভিঃ ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥২
সরস্বতি দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী ।
ধীনামবিত্র্যবতু ॥৪
যস্ত্বা দেবি সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে ।
ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥ ৫
ত্বং দেবি সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি ।
রদা পূষেব নঃ সনিম্ ॥ ৬
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্ ॥ ৭
যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ ।
অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥৮
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৃরন্যা ঋতাবরী ।
অতন্নহেব সূর্যঃ ॥ ৯
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা ।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০
আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্ ।
সরস্বতী নিদস্পাতু ॥ ১১
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী ।
বাজেবাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২
প্র যা মহিনা মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভির্নন্যা অপসামপস্তমা ।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥১৩
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্ ।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ॥ ঋগ্বেদ ৬.৬১.১-১৪
প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ ।

প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ ॥১
একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥২
স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াসু ।
স বাজিনং মঘবদ্ভ্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥৩
উত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ণে অস্মিন্ ।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ ॥৪
ইমা জুহ্বানা যুষ্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতি জুষস্ব ।
তব শর্মন্প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষম্ ॥ ৫
অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ ।
বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজান্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ঋগ্বেদ ৭.৯৫.১-৬
বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্যা নদীনাম্ ।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী ॥ ১
উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ ।
সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥ ২
ভদ্রমিদ্ভদ্রা কৃণবৎসরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী ।
গৃণানা জমদগ্নিবৎস্তবানা চ বসিষ্ঠবৎ ॥ঋগ্বেদ ৭.৯৬.১-৩
সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে ।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৭
সরস্বতি যা সরথং যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী ।
আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৮
সরস্বতীং যাং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি ॥ ঋগ্বেদ ১০.১৭.৭-৯
অবির্ন মেষো নসি বীর্যায় প্রাণস্য পন্থা অমৃতো গ্রহাভ্যাম্ ।
সরস্বত্যুপবাকৈর্ব্যানং নস্যানি বর্হির্বদরৈর্জজান ॥ যজুর্বেদ ১৯.৯০
পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপিয়ন্তি সস্রোতসঃ ।
সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎসরিৎ ॥ যজুর্বেদ ৩৪.১১
সরস্বতীমনুমতিং ভগং যন্তো হবামহে।
বাচং জুষ্টাং মধুমতীমবাদিষং দেবানাং দেবহূতিষু ॥ অথর্ববেদ ৫.৭.৪
যং যাচাম্যহং বাচা সরস্বত্যা মনোযুজা।
শ্রদ্ধা তমদ্য বিন্দতু দত্তা সোমেন বভ্রুণা ॥ অথর্ববেদ ৫.৭.৫
অপানায় ব্যানায় প্রাণায় ভরিধায়সে।
সরস্বত্যা উরুব্যচে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ অথর্ববেদ ৬.৪১.২

ওঁম্ শান্তি শান্তি শান্তি

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

গঙ্গা-যমুনায় স্নান করলেই কি সব পাপ মুছে যায় ?

যদ্দ্বারা জীব দুঃখস্বরূপ সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, (নিত্য) সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্র প্রতিপাদিত তীর্থ আছে, এবং যাহা প্রাচীন আর্য্যগণ অনুষ্ঠান করিতেন, যাহা জীবগণের দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া সুখপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ তৎসমুদায় সাধনকেই তীর্থ বলা যায়। অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার যজ্ঞ হউক না কেন, ইহার মধ্যে কোন একটী যজ্ঞ সমাপ্তির পর, যে স্নান করা যায়, তাহাকে তীর্থ বা তীর্থস্নান বলে।

যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে, তাহার অর্থ এইরূপ, সকল মনুষ্যেরই এইরূপ তীর্থ সেবন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ মন হইতে বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই সুখ বৃদ্ধি হয় এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য এবং কোনরূপ সাংসারিক ব্যবহারে কাহাকেও কোন বিষয়ে দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরন্ত (তান্যত্র তীর্থেভ্যঃ ইত্যাদি) বেদবিরুদ্ধ। যদি কেহ ঐরূপ ব্যবহার কর্ম্ম করেন, তবে দুঃখ বোধ করিলেও, তাহাকে তজ্জন্য দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাহারা অপরাধী ও পাখণ্ডবৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ বেদশাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠানের শত্রু স্বরূপ, অর্থাৎ যাহারা নিজ স্বার্থ বা সুখে প্রবৃত্ত হইয়া, পরপীড়ানাদি দুষ্টকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহারা সদৈব দণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত। এজন্য (যে সকল ধার্মিক লোকেরা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী হইয়া রুদ্র সংজ্ঞাযুক্ত হন, তাঁহারাও সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ) এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রকেও 'তীর্থ' বলে, যাহার পঠন পাঠন করিয়া তদনুযায়ী মার্গে চলিলে, মনুষ্যগণ দুঃখসাগর হইতে ত্রাণ পাইয়া সুখ প্রাপ্ত হন।

(সমানে তীর্থেবাসী) উপরোক্ত অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রের অভিপ্রায় এইরূপ যে, বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশক স্বরূপ যিনি আচার্য্য তথা বেদাদিশাস্ত্র এবং মাতা পিতা ও অতিথিকেও তীর্থ বলা যায়। কারণ ইহাদিগকে যত্ন ও শ্রদ্ধা পূর্বক সেবা করিলে, (ইহাদিগের আজ্ঞা পালন করিলে-অনুবাদক) জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া, দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকেন, এজন্য ইহাদিগকেও তীর্থ বলা হয়।

তিন প্রকার পুরুষই তীর্থে স্নান করিবার উপযুক্ত হইবেন, যথা:- বিদ্যাস্নাতক,ব্রতস্নাতক, বিদ্যাব্রতস্নাতক অর্থাৎ প্রথমতঃ যিনি উত্তমরূপে বেদাদি সত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যব্রত সম্পূর্ণরূপে সমাপন না করিয়াই, জ্ঞানরূপী তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হন, তাহাদিগকে বিদ্যাস্নাতক বলা যায়। আর যিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত ২৫, ৩০, ৩৬, ৪৪ বা ৪৮ বৎসর পর্যন্ত সমাপন করিয়াছেন, পরন্ত সমগ্র বিদ্যা সমাপন করিতে না পারিয়াই সমাবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করেন, তাহাকে কেবল ব্রতস্নাতক বলা হয়, পরন্ত যেজন পূর্ণবিদ্যা, পূর্ণব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া, উভয় প্রকারেই পরিপক্ক হইয়া সমাবর্ত্তন করেন, অর্থাৎ বিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের ফলস্বরূপ উত্তমতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহারা পবিত্র দেহ ও শুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবল ও পরাক্রম দ্বারা পরোপকারে রত হন, তাহাকে বিদ্যাব্রত স্নাতক বলা যায়। (এরূপ লোকেরাও সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ-অনুবাদক)

এইরূপ তীর্থদ্বারা প্রাপ্ত পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরকে যিনি পূর্বলিখিত বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হন, তিনিও সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ। এই পরম তীর্থরূপী পরমেশ্বরকে আমার নমস্কার হউক। (পুনশ্চ) যে সকল বিদ্বান জন বেদাদি সত্যশাস্ত্রের পঠন পাঠনে রত থাকেন এবং যাহারা সত্য কথনরূপ তীর্থের প্রচার করেন, বিশেষতঃ যাঁহারা ৪৪ বা ৪৮ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পূর্ণ রীত্যনুসারে প্রতিপালন করেন, তাঁহারা মহান্ বলশালী হইয়া, দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকর্তা হওয়ায় 'রুদ্র' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এইরূপে (সৃকাহন্তা) যাহার সৃকা অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ হস্ত তথা সংশয়চ্ছেদী উপদেশরূপী তরবারী বিদ্যমান আছে, তিনিও সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ। সত্যোপদেশকেও তীর্থ বলা হয়। উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর, যাঁহার প্রাপ্তি জন্য সাধুগণ উপদেশ করেন, সেই পরমাত্মাকে 'পরম তীর্থ' বা সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা যায়। [ঋ০ভা০ভূ০]

সত্যভাষণ, বিদ্যাচর্চ্চা, সৎসঙ্গ, যমাদি যোগাভ্যাস, পুরুষার্থ এবং বিদ্যাদান প্রভৃতি যে সকল শুভকর্ম দ্বারা দুঃখসাগর হতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সে সকলকে তীর্থ’ বলি, অন্য জলস্থল প্রভৃতি তীর্থ নয়।

★জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বার্যুপাঞ্জনম্ ।
বায়ুঃ কর্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্তৃণি দেহিনাম্ ॥
[মনুস্মৃতি ৫|১০৫]

জ্ঞান, তপ, (শুদ্ধ) কর্ম, (শুদ্ধ) সঙ্কল্প, (শুদ্ধ) আহার, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, সূর্যকিরণ ও সময় দেহধারীদের জন্য শুদ্ধিকারক।

★সর্বেষাং এব শৌচানাং অর্থশৌচং পরং স্মৃতম্ ।
যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥
[মনুস্মৃতি ৫|১০৬]

সর্বপ্রকার শুচিতার মধ্যে শুদ্ধ উপায়ে অর্থসংগ্রহই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। যে অর্থসংগ্রহের দিক থেকে শুদ্ধ সে-ই প্রকৃত শুদ্ধ কেবল মৃত্তিকা বা জল দ্বারা শুদ্ধ হওয়া ব্যক্তি নয়।

★ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥
[মনুস্মৃতি ৫|১০৭]

বিদ্বানগণ ক্ষমার মধ্য দিয়ে, দুষ্কর্মকারীগণ দানের মধ্য দিয়ে, গোপনে পাপকারী (অনুতপ্ত হয়ে) ঈশ্বরের নাম-মন্ত্র জপের মধ্য দিয়ে ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হন। (অর্থাৎ তাঁদের পাপ করার ভাবনা এর মধ্য দিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়)

★অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি ।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥
[মনুস্মৃতি ৫|১০৯]

শরীর জলের দ্বারা, মন সত্যের দ্বারা, জীবাত্মা বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে থাকে।

এইখান থেকে খুবই স্পষ্ট যে কেবল গঙ্গা, যমুনা বা কোনো কথিত পবিত্র নদীই নয় যেকোনো পরিষ্কার জলই বাহিরের দেহকে ময়লা থেকে শুদ্ধ করতে পারে কিন্তু ভিতরের মন, বুদ্ধি, আত্মা জ্ঞান, তপ, উত্তম কর্ম, সত্য প্রভৃতির দ্বারাই শুদ্ধ হয়। এইখানে শুদ্ধ হওয়া বলতে বোঝা উচিত যে পাপভাবনা আসা হতে বা পুনরায় পাপ করার প্রবণতা হতে শুদ্ধ হওয়া। কেননা কৃত অধর্মাচরণ কখনোই নিষ্ফল হয় না [মনুস্মৃতি ৪|১৭৩]। তাই আপনি পাপকর্ম করলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে বা তীর্থভ্রমণ করে তার ফল থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আপনার প্রবৃত্তিকে পুনরায় পাপ করা হতে আপনি শুদ্ধ রাখতে পারেন। যেমন বেদমন্ত্রে আমরা পাই,

★যো নঃ পাপ্মন্ ন জহাসি তমু ত্বা জহিমো বয়ম্।।
[অথর্ব ৬।২৬।২]
(পাপ্মন্) হে পাপ ! (যঃ) যে তুমি (নঃ) আমাদের (ন) না (জহাসি) ত্যাগ করো, (তম্) সেই (ত্বা) তোমাকে (বয়ম্ উ) আমরাই (জহিমঃ) ত্যাগ করব।

এইযে পাপত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প পাপ থেকে শুদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য এইটাই।
© মনুর্ভব - Manurbhava

রাধা রাণীর সত্য উন্মোচন

'রাধা' শব্দটি শুনতেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট একটি নারী চরিত্র। মনে জেগে ওঠে একটি যুগল মূর্তি — কৃষ্ণ ও রাধা একসাথে বাঁশি হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছে। এইসব কথার প্রমাণ চাইলে তাঁরা বিবিধ শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করে যে রাধা রয়েছে, এবং তাঁর সাথে কৃষ্ণের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর.....!

অনেকে আবার বেদ থেকে রাধার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তো চলুন দেখে আসি বেদে রাধার অবস্থান —

পবিত্র বেদে 'রাধা' শব্দটি ৪৩ জায়গায় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদঃ ১/২২/৮, ১/৩০/৫, ১/৪১/৭, ১/৮৪/২০, ১/১০০/১৭, ৩/৩৩/১২, ৩/৫১/১০, ৪/২/৪, ৪/৫/৪, ৪/১৬/১৬, ৪/১৭/৮, ৪/২৪/২, ৪/২৯/১, ৫/৪০/৭, ৫/৪০/৮, ৫/৭৯/৬, ৫/৭৯/৭, ৬/৪৪/১২, ৬/৪৮/৯, ৭/১৫/১১, ৭/১৬/১০, ৭/৩৭/২, ৭/৩৭/৮, ৮/৬/৪৬, ৮/৮/১৩, ৮/৭০/১৩, ১০/২৯/৭, ১০/৪৯/১১, যজুর্বেদঃ ১৯/১৬, সামবেদঃ ৪১, ১৬৫, ৩৩৫, ৩৮৬, ৭৩৭, ১৫০৯, ১৬০০, ১৬২৩, ১৭২৪, অথর্ববেদঃ ১/২৬/২, ১২/২/৬, ১৯/৭/৩, ২০/৪৫/২, ২০/৭৬/৭ । এই সব

মন্ত্রে রাধা শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই রাধা সেই যুগল মূর্তির রাধা নয়। নিরুক্তকার যাস্কের মতে "राध इति धननां" "রাধ ইতি ধননাম" [নিরুক্ত ৪।৪] অর্থাৎ রাধা বলতে ধন বা ঐশ্বর্য বুঝায়।

সেই অনুসারে কিছু মন্ত্রের অর্থ দেখে নেওয়া যাক —

★ সখায় আ নিষীদত সবিতা স্তোভ্যো নু নঃ।
দাতা রাধাংসি শুম্ভতি।।
[ঋগ্বেদ ১।২২।৮]

পদার্থ: (সখায়ঃ) হে মিত্র! (আ নিষীদত) চারিদিক থেকে এসে একত্রে বসো। (স্তোভ্যঃ) স্তুতিযোগ্য (সবিতা) সকল ঐশ্বর্যযুক্ত, জগৎ কর্তা জগদীশ্বরের (নু) শীঘ্র স্তুতি কর, যিনি (নঃ) আমাদের প্রতি (রাধাংসি) ঐশ্বর্যের (দাতা) দাতা, (শুম্ভতি) শোভা দানকারী এবং শোভা যুক্ত।

★ স্তোত্রং রাধানাং।। [ঋগ্বেদ ১।৩০।৫]
হে (রাধানাং পতে) সমস্ত ঐশ্বর্যের স্বামিন্ !

★ তে রাধাংসি।। [ঋগ্বেদ ১।৮৪।২০]
(তে) তোমার (রাধাংসি) ঐশ্বর্য।

★ রাধানাং পতে।। [ঋগ্বেদ ৩।৫১।১০]
হে (রাধানাং পতে) ধনের স্বামিন্ !

★ সুরাধাঃ।। [ঋগ্বেদ ৪।২।৪]
(সুরাধাঃ) উত্তম সুখজনক ঐশ্বর্যের স্বামী।

—— এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পবিত্র বেদে যেসব স্থানে রাধা শব্দের উল্লেখ রয়েছে সেখানে কোনো সাকার রূপধারী ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ নেই।

> তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি বেদে রাধার কথা উল্লেখ না থাকে তাহলে এই রাধা এলো কোথা থেকে?

পৌরাণিক রাধার উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

পুরাণের কথা যেহেতু উঠে এলো তো চলুন পুরাণের রাধার বৈশিষ্ট্য গুলো দেখে নিই —

১. রাধা হলো শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা :

দক্ষিণাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামাঙ্গং সা চ রাধিকা।।
[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড-৪৮/২৯]
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ অংশ শ্রীকৃষ্ণরূপ হলো এবং বাম অংশের অঙ্গ রাধারূপ ধারণ করেছেন।

২. শ্রীকৃষ্ণই রাধা রাধাই শ্রীকৃষ্ণ:

যথা তঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্।।
[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, জন্মখণ্ড-১৫/৫৭]
হে রাধা! তুমিই আমি, আমিই তুমি, আমাদের কোন ভেদ নেই।

৩. রাধা হলো শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী:

গর্গ সংহিতা, গোলকখণ্ড, ১৬ তম অধ্যায়ে ব্রহ্মা দ্বারা রাধা- কৃষ্ণের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মাকে তারা চার মস্তকযুক্ত মনে করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড-৪৮/৪৭ শ্লোকেও 'স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী' বলিয়া উল্লেখিত আছে।

৪. রাধা হলো শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি:

হে রাধা! তুমি আমার এবং সকলের শক্তিস্বরূপা।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড-৪৫/৬৩]

৫. রাধা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিল:

রাধা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন এর উল্লেখ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড-৪৮/৩৮ শ্লোকে রয়েছে।

৬. রাধা মানে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত অর্থাৎ যে/যারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সে/তাহারাই রাধা:

এরূপ বিভিন্ন উত্তর পেয়েছি। যারা রাধাকে কৃষ্ণ হইতে আলাদা এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন তারা সকলেই রাধাকে বৃষভানুর কন্যা বলিয়া জানেন, যার উল্লেখ পুরাণাদিতেও রয়েছে। রাধার মাতার নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায় যে রাধার মাতার নাম কলাবতী।

বৃষভানুসুতা সা চ মাতা যস্যাঃ কলাবতী।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড-২৩/৯৩]

অর্থাৎ, রাধা বৃষভানুসুতা তাহার মাতার নাম কলাবতী।

প্রকৃতিখণ্ড-৪৮/৫৫ শ্লোকেও রাধার পিতা-মাতার নাম বৃষভানু-কলাবতী পাওয়া যায়।

৭. রাধা শ্রীকৃষ্ণের মামি:

অতীতে দ্বাদশাব্দে তু দৃষ্টা তাং নবযৌবনাম্।

সার্দ্ধং রায়াণবৈশ্যেন তৎ সম্বন্ধং চকার সঃ।।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডম- ৪৯/৩৯]

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, বৃষভানু, রায়াণ বৈশ্যের সহিত নবযৌবনা নিজ-কন্যার [রাধার] বিবাহ সম্বন্ধ করে।

৮. রাধা শ্রীকৃষ্ণের কন্যা:

আবির্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ।

তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদভিশ্বজোত্তম।।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড-৫/২৫ ও-৫/২৬]

শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূত হইয়াছিলো, পুরাণজ্ঞ পন্ডিতেরা তাহাকে রাধা নাম দিয়াছেন।

এখানে বিভিন্ন জায়গায় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিভিন্ন সম্পর্কের বর্ণন রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের সাথে কি সম্পর্ক রাধার?

> রাধা সম্পর্কে যারা ভক্তিময় কথপোকথন করে, রাধা নামে দুহাত তুলে নৃত্য করে, রাধা ব্যতিত কৃষ্ণকে চিন্তা করতে পারে না তাদের জন্য মানস ভট্টাচার্যের লেখা "ভণ্ডের ভগবান" এর কিঞ্চিৎ লেখনি —

আমরা পারি। শুধু আমরাই পারি। বীর, তেজস্বী, অসাধারণ, রাজনীতিবিদ, দূরদর্শী, ধর্মরক্ষাকারী ও দুস্কৃতির বিনাশকারী হিসাবে যার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, যিনি নিজে সারাজীবনের বেশীর ভাগ সময় লড়াই আর যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন, একের পর এক দুর্বৃত্তকে বিনাশ করেছেন, গত ৫০০ বছর ধরে তার লীলাকে এমনভাবে আমরা কীর্তন করতে শুরু করলাম যাতে বর্তমান ভাবে গাছের ডালে বসে পা দোলাতে দোলাতে মেয়েদের চান করা দেখা আর মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনষ্টি করা ছাড়া তার কোনও কাজ ছিল না। জীবন যার বীরত্বময় আর যুদ্ধময় আমাদের পাল্লায় পড়ে সেই জীবন হয়ে উঠল। লীলাময় আর নারীময়। সারা জীবনে একটা নারীকে, নিজের স্ত্রীকে যিনি ঠিকমত সময় দিতে পারেননি তাকে ষোলোশ নারীর সঙ্গে নাচিয়ে দিলাম। তিনি কাউকে খোল-করতাল নিয়ে নাচগান করার পরামর্শ দেননি অথচ সেটাকেই মূখ্য করে আমরা কাঁদতে লাগলাম। সেই যে কান্নার শুরু সেই কান্না আজও সমানে চলছে। অলৌকিক অবাস্তব আর যুক্তিহীন কল্পনা মানুষকে কাঁদতে শেখায় । আমরা ভণ্ড। তাই ভক্তের ভগবান যখন ভণ্ডের ভগবান হয়ে ওঠে তখন কেঁদেই কেটে যায়। আমরা কাপুরুষ এবং দুর্বল চিত্ত । যৌনতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। ভক্তের ভগবানকেও আমরা আমাদের মত বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের ভণ্ডামির পাহাড় প্রমাণ ছাই-এর আড়ালে চাপা পড়ে গেছে ভগবান । আর কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না। আমি কেষ্টঠাকুর, নাড়ুগোপাল বা গোপালঠাকুর নয়— আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছি। ভারতের ভগবানকুলের অন্যতম চরিত্র। অসাধারণ বীর এবং বাগ্মী। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা। অত্যন্ত যুক্তিবাদী। জীবন ও সমাজ কেমন হবে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে গীতায়। প্রচণ্ড অস্থির সময়েও কি করে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় তা বলেছেন কুরুক্ষেত্রের মত এক যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। তার এই চরিত্র আমাদের পছন্দ হয়নি। ভক্ত নয় বলে হয়নি। আমরা ভণ্ড। যণ্ড মানে যদি ষাঁড় হয়, তাহলে ভণ্ড মানে ভাঁড় হতে পারে। কৃষ্ণকে নিয়ে আমাদের সেই ভণ্ডামো বা ভাঁড়ামো চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

আমরা জানি ভাবনা আমাদের প্রভাবিত করে। কেউ যদি সর্বদা ভাবে আমি চোর হবো সে চোর হবেই। কেউ যদি ভাবে আমি ভালো হবো, আমাকে ভালো হতে হবে তাহলে সে ভালো হবেই। গত ৬০০ বছর ধরে একদল মানুষ ভাবছেন জগতে একমাত্র কৃষ্ণই পুরষ আর সব নারী। এরকম ভাবতে ভাবতে গোটা ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ অংশ নারীতে পরিণত হয়েছে। দেখতে শুনতে পুরুষের মতে কিন্তু পৌরুষ নেই, তেজ নেই, দীর্ঘদিন ধরে ভাবছে আমরা তো কেউ পুরুষ নই কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ। এরকম ভাবতে ভাবতে নিজেরাই কখন পৌরুষ হারিয়েছি সে হুঁশ নেই। পুরুষ যদি নারী হবার চেষ্টা করে তাহলে নারীও হয় না পুরুষও হয় না। এই মাঝামাঝি লোকের ভিড়ে ভরে গেছে ভারতবর্ষ। চারপাশের অন্যায় সয়ে সয়ে আমাদের পিঠে ঘা চারপাশে ভন ভন করে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত মাছি। তবুও আমাদের চিন্তা নেই চেতনা নেই। আমরা শুধু কৃষ্ণের নামে হাউ হাউ করে কাঁদছি। ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে সেকি হাপুস নয়নে কান্না, দুহাত তুলে কাঁদছি। সেই সুযোগে আমাদের কাপড় খুলে নিয়ে পালাচ্ছে দুষ্কৃতিরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের অর্ধেকটাই দুষ্কৃতিরা দখল করে নিয়েছে। তবুও আমরা কাঁদছি, ভাবছি কৃষ্ণ বড় খুশি হচ্ছেন। কৃষ্ণ জানেন এরা কাপুরুষ। এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তিনি মুচকি হাসছেন এদের ভণ্ডামো আর নপুংসতা দেখে।

এইসব কৃষ্ণ ভক্তরা মিথ্যার জাহাজ। বীর আর সাহসী কৃষ্ণের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনটাকেই ভণ্ডামি দিয়ে আর মিথ্যা দিয়ে চাপা দিয়েছেন। যে কোন টিকিধারী নামাবলীধারী কপালে রস তিলকধারী কৃষ্ণ ভক্তকে জিজ্ঞাসা করুন—আচ্ছা পৃথিবীতে কৃষ্ণ জন্মেছিলেন কেন—অমনি চটপট জবাব কেন লীলাময় এসেছেন লীলা করার জন্য। এই চূড়ান্ত মিথ্যাটি বহুবার বহুজনকে বলতে শুনেছি। প্রেমাবতার প্রেম ছড়াবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। মানুষও গোগ্রাসে গেলে এসব, অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিজে কি বলেছেন তা আমরা পাত্তাই দিই না। কেন ভগবান জন্ম নেন স্পষ্ট করে বলা আছে গীতায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন— —দুষ্কৃতির বিনাশ আর সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য তিনি জন্ম নেন। অধর্ম নাশ করে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য তিনি আসেন (গীতা-৪/৮)। কোন ভণ্ডামো নেই, কোন লুকোছাপা নেই, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন স্পষ্ট বলেছেন, বলেছেন বীর অর্জুনকে, তাহলে কোন বৈষ্ণব ভক্তের কানে কানে তিনি বলতে গিয়েছিলেন যে, আমি লীলা করতে আসি। অথচ কৃষ্ণের এ কথাটা আমরা প্রচার করিনি কারণ দুষ্কৃতি বিনাশ বা ধর্ম সংস্থাপন করতে গেলে সাহস দরকার পৌরুষ দরকার । তার চেয়ে লীলা অনেক সহজ। রস আছে, তাই বার বার লীলার মতো মিথ্যাকথা আওড়ে চলি।

শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলা নিয়েও আমাদের ভণ্ডামোর শেষ নেই। বিভিন্ন বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকে নাদুস-নুদুস গোপালের ছবি। কোথাও ননী চুরি করছে। কোথাও মাখন চুরি করছে। হাতে মুখে লেগে আছে চুরি করে খাওয়া ননী আর মাখন। বাড়ির ছোটছেলেরা আচার বা বিস্কুট চুরি করে খেলে বকুনির অন্ত নেই, অথচ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো চোর কৃষ্ণের ছবি, বিভিন্ন মন্দিরেও, যেন চুরি করে খাওয়াটাই কৃষ্ণের ছোটবেলার প্রধান ঘটনা। আমরা আমাদের স্মরণীয় ঘটনাগুলিকেই ছবি করে তুলে ধরে রাখি। কৃষ্ণের ছোটবেলার ছবি দেখলে মনে হবে ননী আর মাখন চুরিই তার শিশুকালের প্রধান ঘটনা। অথচ বাস্তববুদ্ধি অন্য কথা বলে। ছোটবেলাতেই পুতনা বধ, বকাসুর বধ, যমুনায় কালীয় দমন করে রমনক দ্বীপে পাঠানো, তৃণাবর্ত বধ। এমন নানা বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা জড়িয়ে আছে শিশু কৃষ্ণের জীবনের সাথে। অথচ আমরা এগুলিকে পাত্তা দিই না। তার চেয়ে যশোদা ভগবানের কান ধরে আছে এ ছবি আমাদের অনেক বেশি পছন্দ। আর আমাদের সবচেয়ে পছন্দের নাড়ুগোপাল গোপালঠাকুর। হাতে মণ্ডা, নিদেনপক্ষে নকুলদানা নিয়ে বসে আছেন। আমরা ভণ্ড এবং কাপুরুষ তাই কৃষ্ণের শিশুকালের বীরত্বব্যঞ্জক জীবনকে ঢেকে দিয়েছি নাড়ু আর ননী মাখন দিয়ে, বীরত্বকে ঢেকে দিয়েছি দুর্বলতা আর কাপুরুষতা দিয়ে, মেয়েলি ন্যাকামো দিয়ে।

কৃষ্ণের জন্ম নিয়ে আমাদের হাজার গালগল্প। সেইসব গল্পে আমরা বুঁদ হয়ে থাকি। বাস্তবটাকে এড়িয়ে চলি, সত্যকে খোঁজার কোনও চেষ্টাও করি না। আমরা কিছুতেই বুঝিনা যে শুধুমাত্র লীলা করার জন্য টুক করে ভগবান আকাশ থেকে ঝরে পড়েননি। অন্যান্য আর পাঁচটা শিশুর মত নিয়ম মেনেই তাঁর জন্ম হয়েছে। দেবকীকেও ১০ মাস ১০ দিন গর্ভধারণ করতে হয়েছে। নিদারুণ দুঃখ আর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে কারাগারের মধ্যে, পৃথিবীতে আসতে গেলে ভগবানকেও যে পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলতে হয় এটা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কংসের হাত থেকে বাঁচাতে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে যমুনা পার করে গোকুলে লুকিয়ে রেখে আসতে হয়েছে। অথচ এই বাস্তবকে ভুলে তার যাবতীয় দুঃখ কষ্টকে ভুলে আমরা মনে রাখলাম ননী চোরা কৃষ্ণকে, তাকে পৃথিবীতে আনার জন্য কারাগারের মধ্যে দিনরাত কাটানো গর্ভবতী দেবকীকে ভুলে গেলাম। মনে রাখলাম যশোদাকে। যাকে তেমন

কোনও কষ্টই করতে হয়নি। হাতে পায়ে শিকল বাঁধা বসুদেবকে ভুলে গেলাম। মনে রাখলাম বর্ধিষ্ণু নন্দরাজকে। কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র এই পরিচয় ভুলিয়ে দিলাম অর্ধেকের বেশি লোককে। কৃষ্ণ হয়ে গেলো আর যশোদা নন্দন আমাদের ভণ্ডামি আর গালগল্পের পরিমাণ বেশি বলে। দেওয়ালের গোপালঠাকুর আর ননীচোরার ছবি দেখিয়ে এমন করলাম যে তার ছোটবেলার বীরত্বের কথাগুলি ভুলেই গেলাম।

এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মাষ্টমী হয়। সরকারিভাবে ছুটি থাকে অনেক জায়গাতেই, বিভিন্ন জায়গায় যে উৎসব হয়, তার মূলে হরিনাম আর দইয়ের হাড়ি ভাঙা। ছোট ছোট ছেলেদের হাতে বাঁশি আর মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে ননী মাখন খাওয়ানো হয়। এমন গোপালঠাকুর এখন ঘরে ঘরে। হরিনামের চোটে উঠোন কাদা। দই হলুদে মাখামাখি। অথচ কৃষ্ণের জন্মদিনে অন্যরকম শপথ নেওয়ার কথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে জন্মেছিলেন সেই মথুরার কারাগার আমাদের প্রাণের ধন। সব মুসলমানের যেমন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া। তেমনই প্রত্যেক কৃষ্ণভক্তের উচিত ছিল জীবনে একবার ভগবানের জন্মস্থানে যাওয়া। যাবেন কোথায় ? যে কারাগারে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেটাইতো এখন অন্যধর্মের দখলে। হাজার হাজার বৈষ্ণব অথবা কৃষ্ণভক্ত জন্মাষ্টমীতে দুহাত তুলে নেচে নেচে কাঁদতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণের জন্মস্থান উদ্ধারের কোন চেষ্টা করতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তদের এগুলো শুনতে খারাপ লাগবে, কারণ এটাই নির্মম সত্য। এর মধ্যে ভণ্ডামি নেই। রসের গল্প নেই। এদের পাল্লায় পড়েই ভক্তের ভগবান ভণ্ডের ভগবান হয়েছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভক্তির সাইনবোর্ড। কারও সরু টিকি কারও মোটা টিকি। এদের জিজ্ঞাসা করুন—ভগবান কৃষ্ণের পূতঃ পবিত্র জন্মস্থান অন্যের দখলে গেল কেন। আপনারা তার ভক্ত হয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন না কেন। অমনি ভক্ত বলবে এসবই তো তেনার লীলা। উত্তর একেবারে রেডি। সত্যের মুখোমুখি হলে এমনই হয়। লীলা কি দাদ হাজা চুলকানি নাকি । যখন খুশী যেখানে খুশী হবে। ভক্তদের হবে, ভগবানের হবে, ভক্ত না হয়ে হলে এমনই হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর আর যৌবনকে আরও নীচে নামিয়ে এনেছি। সমগ্র যুবসমাজের কাছে হাসির খোরাক করে তুলেছি ভগবানকে। যাত্রা-নাটক-সিনেমা- আড্ডা-ঠেক সর্বত্র এখন কৃষ্ণকে নিয়ে ফাজলামো হয়। দোষ যুবকদের নয়, কৃষ্ণভক্তদের। কৃষ্ণের কৈশোর আর যৌবনকে আমরা গত ৫০০ বছর ধরে এমনভাবে তুলে ধরেছি যেন কৃষ্ণ একটা লম্পট। যার চরিত্র বলে কিছু ছিল না। যার প্রধান কাজ ছিল মেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্তি করা। স্নানের ঘাটে মেয়েদের কাপড় চুরি। পরের বউকে নিয়ে টানাটানি। লুকিয়ে তার সঙ্গে ক্রীড়া। হ্যাঁ এভাবেই উপস্থাপিত করেছি কৃষ্ণকে। যা সত্যের একেবারে বিপরীত। চরম এবং চূড়ান্ত মিথ্যাকথাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভগবানের লীলা বলে এই কাজকে সমর্থনও করা হয়। ছোট থেকে বড় এখন, সবাই আমরা সেই প্রভাবে প্রভাবিত। পথে ঘাটে স্কুলে কলেজে সর্বত্র এসব নিয়ে হাসিঠাট্টা। আমরা শুনি। কৃষ্ণভক্তরাও শোনে। হজম করতে হয়। কারণ ভণ্ডামি ঢাকতে এসব হজম করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কোন ছেলে যদি তার বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করে অমনি আমরা বলি—কিহে তুমি তো কলির কেষ্ট। এগুলো পরিচিত বাক্যবন্ধনী। অনেকেই শুনি। অনেকেই বলি। একবারও ভাবি না কি বলছি, কেন বলছি। একথা বলে কি আমরা এগুলোই বোঝাতে চাই যে মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে কৃষ্ণভক্ত বলি না। ভণ্ড ভক্তরা বলেন প্রেমময়ের লীলা। স্বর্গে কি অপ্সরার অভাব ছিল।

মর্তে আসতে হলো মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। কিছুতেই সত্য স্বীকার করব না। আমাদের হাড়ে মজ্জায় শিরায় শিরায় এই ন্যাকামি চলছে দীর্ঘকাল ধরে। তাই সিনেমা নাটক গান সর্বত্র কৃষ্ণের কৈশোর যৌবনকে নিয়ে চূড়ান্ত ছ্যাবলামো চলছে। বিকৃতভাবে গাওয়া হচ্ছে ভজ গৌরাঙ্গ। সিনেমায় গোঁফধারী কৃষ্ণ কুঞ্জবনে বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে আর রাধাকে চুমো খাচ্ছে। এসব দেখে কোনও কৃষ্ণভক্ত প্রতিবাদ করেন না। কারণ নপুংসকেরা প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। লাগাতার ভণ্ডামো মানুষকে কাপুরুষ করে তোলে। নিজেদের এই বীর্যহীনতা আর মিথ্যাচারিতাকে সমর্থনের জন্য হাজার যুক্তি। আসলে সত্যের মুখোমুখি হতে হলে সাহসী হতে হবে। বীর্যবান হতে হবে। নির্ভীক হতে হবে। আমরা অসৎ। আমাদের বেশিরভাগের চরিত্র দুর্বল। তাই বীর্যবান তেজস্বী কৃষ্ণও আমাদের পছন্দ নয়। আমরা আমাদের ভগবানকেও আমাদের মতো বানিয়ে নিয়েছি। নিজেদের অবদমিত ইচ্ছাগুলো চাপিয়ে দিয়েছি ভগবানের উপর। নিজেরা মেয়েদের চান করা দেখতে গেলে লোকে ঠ্যাঙাবে। তাই ভগবানকে দিয়ে দেখিয়েছি। পরের বউ এর সাথে প্রেম করলে ধরা পরার ভয়, ভগবানের প্রেম বলে চালিয়ে দিচ্ছি। বয়সকালে একটা মানসিক তৃপ্তিতো পাওয়া যাচ্ছে। ভক্তিও হলো আবার তৃপ্তিও হলো।

এমন বাড়ি খুব কমই আছে যেখানে রাধাকৃষ্ণের ছবি নেই। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি তে প্রায় বাঙালি বাড়িতে। শিখিপুচ্ছধারী বাঁশিধারী কৃষ্ণের পাশে রাধা। এ ছবি আমাদের চিরচেনা। এখনতো এমন অনেক সংগঠন আছে যারা কৃষ্ণের থেকে রাধাকে বেশি গুরুত্ব দেন। আমরা যদি গালগল্প ভালো না বাসতাম তাহলে কখনই এগুলো সম্ভব হতো না। তমাল তলায় কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে দোল খাচ্ছে এটা ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু যুক্তিতে টেকে না। একবারও ভাবিনা কৃষ্ণের গোটা যৌবনটা যদি রাধাকে নিয়ে দোল খেতে খেতে কেটে গেল তাহলে এত যুদ্ধবিগ্রহ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধবধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপরিচালনা এসব কখন করলেন। দুটো চরিত্রকে মেলানো যাবে কি ভাবে, যাঁর জন্ম দুস্কৃতিদের বিনাশ আর সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, তিনি রাধা নামের এক পরস্ত্রীকে নিয়ে তমালগাছে দোল খাবেন এতো অতি বড় কষ্টকল্পনা। তবুও আমাদের ছেলেমেয়েদের মন থেকে কৃষ্ণের সেই তেজস্বী রূপটাকেই মুছে দিতে পেরেছি। আমাদের দীর্ঘদিনের ভণ্ডামো আর মিথ্যাচারিতা দিয়ে। দাদের ধারে ধারে চুলকেও তৃপ্তি।

প্রায় বছর দশেক আগের কথা। এক কৃষ্ণভক্তের বাড়িতে বসে আছি। তার বাড়ির দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের ছবি। যেমন থাকে জড়াজড়ি করে, রাধার প্রায় শিথিল বসন, হঠাৎ ক্লাস ফাইভে পড়া ছেলেটি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা বাবা রাধা কি কৃষ্ণের বউ। বাবা নিরুত্তর, অনেক কষ্টে ঢোক বলেন না রে বউ নয়। ছেলের মা বাবা পরস্পরের দিকে তাকায়। নাইনে পড়া দিদি পড়া ছেলে উঠে এসে বলে –তুই জানিস না রাধা কৃষ্ণের মামিমা ছিল। ছেলে বলে তাহলে ওরকম জড়িয়ে ধরেছে কেন, বাবা মা নিরুত্তর। আমাদের প্রতিক্রিয়া যে কি সুদূরপ্রসারী হতে পারে তা ভাবি না। আমরা নব নব তত্ত্বের অবতারণা করি। আমরা বলি রাধাই কৃষ্ণের শক্তি, আবার সেই শক্তির নানা নাম দিই। শিশু কিশোররা এসব শক্তিও বোঝেনা, তত্ত্বও বোঝেনা । ছোট থেকে ওই ছবি দেখতে দেখতে তাদের মনে আঁকা হয় কৃষ্ণ বনে বনে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়াত, আর নিজের মামিমার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত। সেটাই তাদের মনে থাকে সারাজীবন। আমি জানি কৃষ্ণভক্তরা এসব শুনে রেগে যাবেন।

কারণ এগুলো সত্য, সত্য শুনলে সবার রাগ হয়। খোঁড়াকে খোঁড়া বললে, কানাকে কানা বললে রেগে যায়। সুতরাং এসব শুনে ভণ্ড ভক্তরাও রেগে যাবেন।

কৃষ্ণের জীবনে আদৌ রাধার অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। রাধাতত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করার জন্য আলাদা একটা বই লেখা যায়। কৃষ্ণের জীবনে যে রাধার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই তাও প্রমাণ করা যায়। অথচ আমরা সেই গালগল্প বিশ্বাস করি। আমরা মুখে বলি 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই তা ভারতবর্ষে নেই। মহাভারতের প্রতিটি পাতা আঁতিপাতি করে খুঁজেছি। কোথাও রাধার নাম পর্যন্ত নেই। অথচ রাধা ছাড়া বাকি অনেকের আছে। কৃষ্ণের জীবনদর্শন গীতা। গীতা সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতার কোথাও রাধা নেই। অথচ এমন নয় যে মহাভারতে কোথাও রাধার নাম উল্লেখের জায়গা ছিল না। নারদ নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকে। গোকুল থেকে। সকলে আকুল। সত্যভামা রুক্মিনীসহ অনেকের নাম আছে। রাধা নেই। পাণ্ডবদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গোকুলে যাচ্ছেন কৃষ্ণ। নিজের বাবা মা পালিত বাবা মার জন্য মন খারাপ । আরও অনেকের জন্য মন খারাপ । রাধার নাম নেই, মহাভারতের শেষ পর্বে কৃষ্ণের বহু প্রিয়জন বহু সখীর নাম আছে রাধার নাম তার মানে কৃষ্ণের জীবনে রাধা প্রক্ষিপ্ত। আমাদের অবদমিত মনের ফসল। কৃষ্ণের রাধাপ্রেম ঝুলন এসব গল্প, সত্য নয়। অথচ সেই গল্পেই আমাদের বিশ্বাস। আর গল্পের গরু যেমন গাছে ওঠে তেমনই রাধার গল্প বিশ্বাস করানোর জন্য আরও গল্প আরো বর্ণনা। বীরপুরুষকে কাপুরুষ বানানো ঠিক আমাদের মত করে।

যে রাধার অস্তিত্ব শুধু গালগল্পে সেই রাধার জন্য ভগবানকে দিয়ে কি না। করিয়েছি। শেষে পা পর্যন্ত ধরিয়েছি। ‘দেহি পদপল্লব মুদারম’, শুনে আমরা গদ গদ হই। অনেকের দুচোখ বেয়ে গড় গড় করে জল পড়ে। ভাবিনা যে কৃষ্ণের মতো বীরপুরুষ এমন পায়ে ধরতে যাবেন কেন। সত্যভামা পারিজাত চেয়েছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করে ফুলসুদ্ধ পারিজাত গাছ এনে পুঁতে দিলেন। সত্যভামার দরজায়। বীর যুবকের মতো কাজ। কিন্তু কঠিন, তাই আমরা সেটা ভুল গেলাম, তার থেকে পা ধরা অনেক সহজ সেটাকেই গ্রহণ করলাম মনে প্রাণে। ভণ্ডামির চূড়ান্ত।

এখন যদি কেউ বলেন রাধা আর কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে নিয়ে অসংখ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তবে তাকে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। একথা সত্য যে রাধা কৃষ্ণের প্রেমভাব সংস্কৃত আর বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। সেখানে গোল বেঁধেছে ওইসব সাহিত্যকে ধর্মের সঙ্গে এক করে দেওয়ায়। রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বক্তৃতার ফুলঝুরি ছোটে বৈষ্ণব গুরুদের মুখে। মূলত তিনটি যুক্তি দেন। এক, রাধা কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা। দুই, এই দুইয়ে কোন ভেদ নেই। রাধাকৃষ্ণ অভেদ। তিন, জগতে প্রেমের বিস্তারের ক্ষেত্রে রাধা প্রেমের বড়ো ভূমিকা আছে। বার বার এগুলি শুনি। আমাদের বোঝানো হয় যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম নাকি অধ্যাত্মভাব ভক্তি আর প্রেমের সঞ্চার করে। এগুলো সব আবেগের কথাবার্তা। ভাবের ভক্তির বা ভণ্ডামির কথাবার্তাও হতে পারে। কারণ এর সারবত্তা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না।

শিশুকাল থেকে পূর্ণযৌবন পর্যন্ত কৃষ্ণ অনেক যুদ্ধ করেছেন। শেষে ব্যাধের তীরের আঘাত মরেও গেছেন। যা করেছেন নিজের শক্তি প্রতিভা সাহস আর ক্ষমতা দিয়ে। কোথাও বলেননি রাধাই আমার শক্তি। কোথাও রাধার নামই করেননি। কাউকে বধ করতে যাবার আগে রাধার আরাধনা করেননি। একবারের জন্যও বলেননি, হে রাধা আমাকে শক্তি দাও। রাধা যদি শক্তিস্বরূপা হতো তাহলে কায়দা করে জরাসন্ধকে, সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালকে, ক্ষমতা দিয়ে কংসকে মারার দরকার হতো না। ভীম যখন জরাসন্ধকে কিছুতেই মারতে পারছেন না তখন তিনি নিশ্চয় বলতেন—ভীম তুমি ১০৮ বার রাধা নাম জপ করো তাহলেই জরাসন্ধ হত হবে। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে বা গীতায় একবারও স্বীকার করেননি যে রাধাই তার শক্তি। কারণ এগুলো সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ যা বিশ্বাস করেননি আমরা তা বিশ্বাস করি। শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী ও যুক্তবাদী। আমরা আবেগবাদী ও মিথ্যাবাদী। অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত বলেন --- রাধাকৃষ্ণ অভেদ। এটা আরেক প্রবঞ্চনা। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে মানুষের গর্ভে তেমনই রাধারও হয়েছে। দুজনেরই বাবা মাও আলাদা। লিঙ্গও আলাদা। গায়ের রং আলাদা। এমনকি চিন্তাভাবনাও আলাদা। তাহলে অভেদ কিসে। জানি ভণ্ডরা কি বলবেন। বলবেন সেটা বোঝাই তো লীলা। সেই একই চুলকানি। যা বুঝতে পারো না তাই লীলা। আগে বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে যেতাম। অনেক ছবি বুঝতাম না। সহপাঠীরা বলতো ABSTRACT আর্ট। এই অভেদতত্ত্বও তাই। যুক্তি তর্কের বাইরে। অথচ কৃষ্ণ বরাবর যুক্তিবাদী। তা সে রাজসভাতেই হোক বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক। সবসময় সর্বত্র যুক্তি দিয়েছেন। আমরা যুক্তিহীন। আমরা একবারও প্রশ্ন তুলি না। ব্রহ্মবৈবর্ত নামে একটি পুরাণ আছে। সেখানে আবার রাধাকৃষ্ণের বিয়ে এবং বিয়ের পর সারারাত কাটানোর সরস গল্পও আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্রে ছত্রে যে রাধাপ্রেমের ঘনঘটা তা কোন্ অভেদতত্ত্ব প্রমাণ করে। তা তো আমার আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতই। নেহাত তখন মোবাইল ছিল না, নাহলে বড়াইবুড়ির দরকার হতো না। সুতরাং অভেদ তত্ত্ব ধোপে টেকে না।

বৈষ্ণব কুলশিরমনিদের তৃতীয় যুক্তি— রাধাকৃষ্ণের প্রেম নাকি জগতে সমাজে প্রেমের সঞ্চার করে। বুদ্ধি যখন বাস্তবতা হারায় তখন এমন চিন্তাই আসে। গত ৫০০ বছরের বেশিসময় ধরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গল্প শুনে আসছে মানুষ। তাহলে পৃথিবীতে এত বিদ্বেষ কেন, এত হিংসা কেন। এত যদি প্রেমের ঘনঘটা তাহলে ভারতবর্ষে আজ এত প্রেমের অভাব কেন। জীবনানন্দের মত কবিকেও কেন লিখতে হয়—জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই। রাধাকৃষ্ণের নামে দেশ জুড়ে প্রেম বিলিয়ে বেড়ান তাদের বেশিরভাগ এত রুক্ষ মেজাজী কেন। ভক্তে ভক্তে এত হানাহানি কাটাকাটি কেন।

গরিব বড়লোকে এত পার্থক্য কেন। আমি জানি এইসব কেনর উত্তর বৈষ্ণব বাবাজীরা এক কথায় দেবেন—সবই লীলা। সেই একই উত্তর চুলকানি। আমাদের একবারও মনে হয় না ভগবান নিজে যাকে যেমন তাকে তেমন শাস্তি দিয়েছেন, নিজে বলেছেন আমি দুষ্ট লোকেদের মারতে এসেছি – সেই ভগবান অন্ততঃ অহেতুক প্রেম ছড়ানোর কথা বলবেন না। ভগবান না বলছেন তো কি হয়েছে আমরা বলছি, কারণ প্রেমের এই ধাপ্পাবাজিটা আমাদের ভালো স্যুট করে। তাতে সমাজের যা হচ্ছে হোক। আমাদের তো মানসিক তৃপ্তি। কৃষ্ণ হতদরিদ্র সুদামাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এদেশের বেশিরভাগ বৈষ্ণবগুরু গরিব দরিদ্রের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। স্টেজে

উঠলেই আবার সেই বস্তাপচা প্রেমের গল্প। এমনই চলছে শত শত বছর ধরে। ভণ্ডামো আর মিথ্যাচারিতার ধারাবাহিকতা। এ সিরিয়াল চলছে দিনের পর দিন।

রাধা মহাভাবস্বরূপিণী অথবা মহাশক্তির দ্যোতক এসব তো নিছকই কল্পনা বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে রাধার কোন মহাভাবের অথবা মহাশক্তির পরিচয় তো আমরা পাই নি। বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্রে ছত্রে রাধার যে প্রেম তাতো নিছক একালের কলেজে পড়া প্রথম বর্ষের মেয়েদের মতো ।

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে শুনে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
এ তো স্রেফ শরীরী প্রেমের ঘনঘটা। একালের অবুঝ কলেজছাত্রীরা যেমন বাবা-মা'কে লুকিয়ে রাত জেগে মোবাইল অথবা ফেসবুকে প্রেম করে এ তো তেমনিই। রাতের অন্ধকারে অভিসারে। এর মধ্যে কোন গভীর তত্ত্ব সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সাধারণ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে না, সমাজের বা সাধারণ মানুষের যা কাজে লাগে না তা নিয়ে বেশি মাতামাতি করে লাভ কি? রাধার এই লালসা তো চণ্ডীদাসও ধরতে পারেন নি। তিনি তা নিজেই লিখেছেন।
"বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী-
—তাহে কুলবধূ বালা, কিবা অভিলাষে—
রচয়ে লালসেনা বুঝি তাহার ছলা।"
সুতরাং প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে এই দুর্বোধ্য বাস্তবতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা তো নিরক্ষর মানুষকে 'বিগব্যাং থিয়োরী' বোঝানোর মতো। রাধার মহাভাব স্বীকার করলে একালের সব কলেজ ছাত্রীই রাধিকা । বরং তাদের ভাব আরও প্রবল। রাধার প্রেমের মধ্যে তাও একটু ভয় ছিল। এখনকার মেয়েদের মধ্যে সেই ভয়টুকুও নেই। রাধা মহাশক্তিস্বরূপা। রাধাই কৃষ্ণের শক্তি। এর যুক্তি কোথায় । রাধার যে লীলা; তার যে জীবন সেখানে শক্তির প্রকাশ কোথায় তা অন্ততঃ বাহ্যদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। লুকিয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে অন্তত সামাজিক দৃষ্টিতে কোন মহাশক্তি চোখে পড়ে না। রাধা না কোন অসুর বধ করেছিলেন অথবা সামাজিক ভাবে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন, সমাজ গঠনে সাহায্য করেছিলেন এমন কোন শক্তির প্রকাশ আমরা দেখি না। আমাদের বাড়ির মেয়েরা যে ছেলের সঙ্গে প্রেম করে তার সঙ্গে আমরা তার বিয়ে দিতে না চাইলে সে মেয়ে যেমন দরজায় খিল এঁটে বসে থাকে, তেমনই অবস্থা রাধারও। বিরতি আহারে রাঙাবাস পড়ে যেমত যোগিনী পারা। এর মধ্যে মহাশক্তি কোথায়?

কৃষ্ণ যখন গোকুল ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছেন কংসকে বধ করতে। ব্রজবাসী কেঁদে আকুল । কৃষ্ণ যদি মনে করতেন রাধাই তার শক্তি তাহলে তো রাধাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। রাধাকে বলতেন—চল রাধা, তুমিই তো আমার শক্তি। তুমি না গেলে আমি কংসকে কি করে মারব। তুমিই তো আমার শক্তি, চলো। আমার রথে ওঠো। তারপর আবার ফিরে চলে আসবে। সে কথা কিন্তু কৃষ্ণের মুখে শোনা যায় নি। বরং অন্যান্যদের সঙ্গে রাধাও কেঁদেছেন।

কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবার পরবর্তী কালে রাধার নাম পর্যন্ত করেন নি। তাহলে কি করে বিশ্বাস করবো রাধা কৃষ্ণের শক্তি স্বরূপ। এ ন্যাকামো অন্ধভক্তিতে চলতে পারে, যুক্তিতে টেকে না। জ্ঞানেও না।

বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্ব অনুসারে ভগবানের তিনটি শক্তি। চিৎশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি। এই চিৎশক্তির আনন্দ অংশের নাম হ্লাদিনী শক্তি। সেই শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ রাধার মধ্যে। বৈষ্ণবরা এও বিশ্বাস করেন যে শ্রীরাধা অথবা শ্রীমতী রাধারানী মহাভাব স্বরূপিণী। রাধা কৃষ্ণগত প্রান। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। এই ধারার প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের বিকাশ হয়। আমি জানি এসব তত্ত্বকথা সাধারণ মাথায় ঢোকার কথা নয়। লৌকিক দৃষ্টিতে সাধারন মানুষ হিসাবে আমরা যা দেখি তা হলো— রাধা একজন সুন্দরী মহিলা। পরস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে পরপুরুষ। সামাজিক শাসন অস্বীকার করে, আত্মীয় স্বজনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপেক্ষা করে রাধা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। বৈষ্ণবরা এর মধ্যেই পরমপুরুষের সঙ্গে মিলনের আকুলতা দেখেন। এখন প্রশ্ন হলো এই সব তত্ত্ব ও তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে যদি দেখি আমার আপনার ঘরের বউ যদি রাধার মতো রাতের আঁধারে ঘর ছেড়ে পরপুরুষের কাছে যায় এবং তারপর আপনি কোন প্রশ্ন করলে সেও যদি ধারার মত বলে —— - "কুলমরিয়াদ-কপাট উদ্ঘাটলু তাহে কি কাঠ কি বাধা।।" তাহলে কি আমাদের খুব ভালো লাগবে। সমাজ সংসার তাতে কি রক্ষা পাবে। বস্তুত বৈষ্ণবদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি—সব বাড়ির বউরা যদি রাধা হয় তাহলে সমাজ-সংসারে কোন্ উপকার সাধিত হবে? এমন পরকীয়া দিয়ে আমরা সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারবো ? একগাদা গোপী কৃষ্ণকে ঘিরে নাচছেন তা দেখতে বা শুনতে ভালো লাগতেই পারে। কিন্তু জগতের কোন উপকার সাধিত হবে না। আধ্যাত্মিক চেতনা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। সমাজ চেতনাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলা কেন? ভারতের শক্তিস্বরূপা দেবীদের আরাধনা করি। দুর্গা আছে, কলি আছে, লক্ষ্মী, সরস্বতীও আছে। চণ্ডী জগদ্ধাত্রী সবই আছে। সেই শক্তির দেবীদের তালিকাতেও রাধা নেই। যদি আমরা বুঝতাম রাধা শক্তির আধার। তাকে ছাড়া আমাদের গতি নেই, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এতদিন রাধা পূজায় মেতে উঠতাম।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাতৃত্ব। প্রতিটি নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে। সেই মনুষ্য চরিত্রই হোক বা দেবী চরিত্র। মা দুর্গা, মা কালি, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী এসব সাবেকী মায়েরা তো আছেন। এমন নয় যে আমরা সবার ছেলেপুলের নামও জানি তবুও দেবী হিসাবে আমরা মায়ের আসনেই বসিয়েছি। রাধার সে যোগ্যতাও নেই। শুনেছেন কেউ কখনও বলেছেন 'মা রাধা'। মালা টিকি শোভিত, বৈষ্ণবগণ এনিয়ে নানাতত্ত্ব কথা বলেন। এর কিছু কারণও দেখান। কিন্তু এসব... ছেদো যুক্তি। ধোপে টেকে না। মায়ের দেশ ভারতেই রাধার মাতৃত্বের উত্তরণ ঘটেনি। তার পরেও রাধা প্রেম কান্তা প্রেম, পরকীয়া প্রেম এসব নিয়ে আমাদের কি মাতামাতি। কৃষ্ণ আদর্শ ভুলে গিয়ে সমাজকে সংগঠিত না করে শুধু রাধা প্রেম নিয়ে মেতে থেকে যা হবার তাই হচ্ছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম-মানিক পাবার আশে-সাগর শুকাল মানিক লুকাল অভাগ। করম দোষে।। রাধা নিজেও জানতেন তিনি অভাগী ।

এখন দেশের বৈষ্ণবদের দোষে কৃষ্ণের অবস্থা বেহাল। কিছুদিন আগে একটি আশ্রমে মচ্ছব চলছিল। অন্যান্য আরও আশ্রমে যে সব ছবি দেখা যায় । এখানেও তাই। আশ্রমের বাইরে ক্ষুধার্ত একদল কুকুরের সঙ্গে ভিখারীদের মারামারি। এক যুবক ছেলেকে ডেকে বললাম, ভাই কুকুরগুলোকে একটু তাড়িয়ে দেবে। আমার কথা বোধহয় মহারাজ শুনতে পেলেন । মহারাজ বলেন, না না, ছি ছি, আমরা অহিংসার পূজারি। আমার আশ্রমে কুকুর মারা যাবে না বাবা। ওরাও তো প্রাণী। বললাম কিন্তু ছেলেমেয়ে গুলোকে কামড়ে দেবে সে। বললেন, বাবা সবই তো কৃষ্ণের লীলা। ওসব শুনে আর মাথার ঠিক ছিল না। বললাম, মহারাজ কিছু মনে করবেন না, আপনার কি মনে হয় কৃষ্ণের জীবন অহিংস ছিল। কৃষ্ণের জীবনের কোন অংশই তো অহিংস নয়। সেখানে তো সমাজ ও যুগের প্রয়োজনে হিসাংই হিংসা। একের পর এক হত্যা। শুধু হত্যা নয়। কুরুক্ষেত্রের মাঠে দাঁড়িয়ে' তো রীতিমত হিংসার প্ররোচনা। হত্যা করতে, যুদ্ধ করতে প্ররোচনা। এমনকি তিনি আবার যদি আসেন সেতো দুষ্কৃতিদের বিনাশ করতে আসবেন। বাবাজী চুপ করে গেলেন। ক্রুদ্ধ হলেন কিন্তু কিছু বললেন না। বললেন, চলুন ওঠা যাক।

বৈষ্ণবদের বাবাজীদের এই মৃত্যুসাধনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। আমাদের খিচুড়ি । খাওয়া যখন শেষের দিকে তখন কানে এলো মাইকে গান- -"মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব"। বাবাজীকে বললাম— শুনছেন। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাজীবন যদি কেবল 'মরিব মরিব' করেন—যদি জোর দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই মরিব। তাহলে আপনাদের বাঁচাবে সাধ্য কার। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও ক্ষমতা নেই এইসব ভণ্ড কৃষ্ণভক্তদের বাঁচাবার। গীতার শেষে আছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই বিজয়। এতো দেখছি উল্টো। পরমপুরুষ তেজস্বী, বীর, শ্রীকৃষ্ণের নামে মৃত্যুসাধনা। কৃষ্ণ সারাজীবন শেখালেন জীবনের সাধনা। আমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে মেতে গেলাম মৃত্যুসাধনায় ।

কৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে নানা কথা বলেছেন। তত্ত্বকথা, গৃহ্যকথা। সবশেষে বলেছেন— সবই তো শুনলে এবার – "যথেচ্ছসি তথা কুরু"। অর্থাৎ যেটা ভালো বোঝ তাই কর। আমাদের বোঝা উচিত ছিল—এই হলো যুগের উপযোগী কথাবার্তা। যুগ ও সমাজ কি চাইছে তা বিচার করা। যুক্তিবাদী হও। চারপাশটা ভালো করে দেখ। তারপর তোমার যা ভাল মনে হয় তা কর। এর চেয়ে সহজ যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য আর কি হতে পারে।
যদি আমরা প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত হতাম তাহলে চারপাশটা দেখে নিতাম । কৃষ্ণ যেমন শত্রু-মিত্র চিনতেন, তেমনই আমরা কে শত্রু আর কে মিত্র তা জেনে নিতাম। যখন যেমন তখন তেমন প্রয়োজন বুঝে কাজ করতাম । পাঁচশো বছর আগে কে কি বলে গেছে তা নিয়ে নিশ্চয় মেতে থাকতাম না। কবেকার কোন এক রাধা যে আবার চোখে কাজল পরে চিত্ত হরণে দক্ষ তাকে এখন না হলেও চলবে। হিন্দুসমাজ যদি না থাকে, তাহলে টিকিধারী মালাধারী, চৈতনধারী রসকলিধারী কোন বৈষ্ণবই থাকবে না। একা রাধা বৈষ্ণবী সেজে তখন আর বসে থাকার জায়গা পাবে না। কোন বৈষ্ণব পদকর্তাও আর লিখতে পারবেন না—"এমন পিরিতে কভু-দেখি নাই শুনি—পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।" দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে—'পিরীতি নগরে বসতি করিব-পিরিতে বান্ধিব ঘর-পিরিতি দেখিয়া পড়শি করিব, তা বিনে সকলি পর।' প্রত্যেক বৈষ্ণবের এটুকু অন্ততঃ মনে রাখা উচিত যে

পিরিতি নগরে বসতি স্থাপন করতে গেলে হিন্দুসমাজ দরকার। পিরীতি পালঙ্কে শোয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার । এখন ভারতের কোন পুরোপুরি সিদ্ধ বাবাজীও ভাবেন না যে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে পিরিতি নগর গড়ে উঠবে। গান্ধারীর দেশ গান্ধারের তালিবান, অঞ্চলে - যদি রাধা যান তাহলে তার কি হাল হবে কেউ কি ভেবে দেখেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী ছিলেন। তাকে নিয়ে একালের বৈষ্ণবদের যে ন্যাকামো তা ছিল না কোথাও। আমরা যদি ভণ্ড কৃষ্ণভক্ত না হই তাহলে আমরা অন্ততঃ এটুকু শপথ নিতে পারি যে-ভাগে আমরা ভারতের যেটুকু অংশ পেয়েছি সেটুকুকেই আমরা বৃন্দাবন বানাবো। কৃষ্ণের দেশে এত আতঙ্ক-এত সন্ত্রাসবাদী কেন। এটাকে আমরা নিধুবন বানাবো। কৃষ্ণের নামে সেটুকু সৎসাহস কি আমরা দেখাতে পারি,,,,,,!

সর্বশেষে রাধা কোনো ব্যক্তি চরিত্র নয়, বরং একটি কাল্পনিক চরিত্রমাত্র। তাই আমাদের উচিত যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ চরিত্রকে কলঙ্কিত না করে, তাঁর প্রকৃত ভাবধারাকে নিজের মধ্যে ধারণ করা।

বৈদেহ্যাং চ যথা রামো রুক্মিণ্যাং চ জনার্দনঃ।
[মহাভারত উদ্যোগপর্ব-১১৭/১৭]
অর্থাৎ যেমন বিদেহনন্দিনী সীতার জন্য রাম তেমনি রুক্মিণীর জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতোও আমাদের জীবন হয়ে উঠুক সৌহার্দ্য, সংকল্প এবং বীরত্বময় এই প্রার্থনা।

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ব্যভিচার-বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর আর্যোদ্দেশ্যরত্নমালা গ্রন্থে ব্যভিচারের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন -

“ নিজের স্ত্রী ব্যতীত পরস্ত্রীর সাথে সমাগম করা, স্বীয় স্ত্রীকেও ঋতুকাল ব্যতীত বীর্যদান করা, স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসেও বীর্যের অতিশয় নাশ করা তথা যুবাবস্থা ব্যতীত বিবাহ করা – এসকল [আচরণকে] ‘ব্যভিচার’ বলে এবং এগুলো পরিত্যাগ করাকে ‘ব্যভিচার ত্যাগ’ বলে।**”**

বৈদিক শাস্ত্রে আমরা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নানা উক্তি পাই । উদাহরণস্বরূপ ~

১. শ্বশুরায় বয় উষো.....শ্নথিতা বৈতসেন [ঋগ্বেদ ১০।৯৫।০৪] = ব্যভিচার দণ্ডনীয়;

২. জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে [ঋগ্বেদ ১০।৯৫।০৮] = শাসক ব্যভিচারী ও নির্যাতনকারীদের থেকে প্রজাদের (নারী ও শিশু) রক্ষা করবেন;

৩. সনাদগ্নে মৃণসি য়াতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ [সামবেদ ৮০] = পরমাত্মা আমাদের ব্যভিচারের নিমিত্তে আগত অবৈধ কাম নষ্ট করুন;

৪. প্রমিনতী মনুষ্যা য়ুগানি য়োষা জারস্য [ঋগ্বেদ ১।৯২।১১] = ব্যভিচারী নারী পুরুষ নিজেদের আয়ু নাশ করে।

সত্যার্থ প্রকাশের ৪র্থ সমুল্লাসে মনুস্মৃতির ৪।১৫৬,১৬০ ব্যাখ্যার পরবর্তীতে মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে লিখেছেন -

১। ব্যভিচার কখনো না করা

২। ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, পরপুরুষগম না করা

৬ষ্ঠ সমুল্লাসে মহর্ষি লিখেছেন,

" ব্যভিচার ও বিষয়াসক্তির মতো বল-বুদ্ধিনাশক অন্য কোন কাজ নেই । "

'সংস্কারবিধি' গ্রন্থের গৃহস্থাশ্রমপ্রকরণে মনুস্মৃতির ৩।৫৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহর্ষি লিখেছেন,

"যে কুলে নারীরা স্ব স্ব পতির বেশ্যাগমনে বা ব্যভিচারাদি দোষে শোকাতুর থাকে, সেই কুল শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং যে কুলে নারীরা পতির সদ্ব্যবহারে প্রসন্না থাকে, সেই কুল সর্বদা উন্নতি লাভ করে । "

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ছেলেদেকে কামভাব থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য তথা কামপরবশ মানবের জন্য ৩টি উপায় দিয়েছেন -

১। একস্থানে স্থির থাকো, কোন নৃত্য বা প্রমত্তোল্লাসে যেও না ।নারীদের দিকে তাকিও না । নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমে এই স্বভাব লাভ হবে ।

২। দিনরাত প্রণব জপ করো, যখন খুব আলস্য লাগবে ঘুমিয়ে পড়ো, একে সুষুপ্তি নিদ্রা বলে । বেশী ঘুমালে মানবীয় কল্পনায় নানারকম ভ্রম দেখা দিতে পারে । ঘুম থেকে উঠে ভজন শুরু করো ও প্রাতঃকালের শৌচাদি সম্পন্ন করে খেয়ে নাও ।

৩। নিন্দনীয় দৃশ্য দেখবে না, শুনবে না, চিন্তাও করবে না । বরং সব সময় ব্রহ্ম ধ্যানে থাকবে ।

[মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত্র, পৃষ্ঠা ৮০]

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী যেসময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখনকার দিনে অনেকস্থলেই ধনী, উচ্চবিত্তরা প্রকাশ্যে নিজেদের কাছে পতিতা রাখতো । মহর্ষি দৃঢ়ভাবে এই কুব্যসনের খণ্ডন শুরু করেন । স্বামীজীর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে

বহু যুবক ও পরিণত মানুষ এই কর্দমাক্ত পথ থেকে বেরিয়ে এসে বৈদিক সনাতন ধর্মের পথে যাত্রা শুরু করে ।

শেঠ পান্নালালজী ছিলেন স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত । একবার এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাকে বললেন - "আপনি যদি আমার ছেলেকে স্বামীজীর দ্বারা সংশোধিত করেন তবে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ মনে করবো ।"

উল্লেখ্য সেই যুবকটি খুবই উশৃঙ্খল ছিল । সে তার নিজের বাড়ি, কৃষিকাজ দেখাশোনা করতো না। সে প্রতিদিন পতিতাদের কাছে ঘোরাঘুরি করতো এবং দিনরাত তাদের কাছেই পড়ে থাকতো ।

পান্নালালজী স্বামীজীর কাছে সেই যুবকের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং তাকে সংশোধন করার জন্য প্রার্থনা করলেন। মহারাজ বললেন, " আপনি তাকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসুন । আমি তার পাপপ্রবৃত্তি দূর করব । "

পান্নালালজী দু'জন সদাচারী যুবককে ডেকে বললেন কোনোভাবে সেই অসভ্য বেশ্যাসক্ত যুবককে রাজি করাতে এবং তাকে স্বামীজির কাছে নিয়ে যেতে । এই দুই যুবক বেশ্যাসক্ত যুবককে তিনদিন ধরে বারবার স্বামীজীর সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করে স্বামীজীর নিকট নিয়ে আসে এবং বিনম্রভাবে প্রণাম করে সামনে বসে পড়ে ।

মহারাজ স্বীয় প্রেমপূর্ণ চোখের পবিত্র জ্যোতিতে যুবকদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে উপদেশ দিতে লাগলেন –

“সৌম্য যুবকগণ ! যদিও সকল আসক্তিই খারাপ, কিন্তু বেশ্যাসক্তি সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। এই আসক্তি মদ পানের আসক্তিকেও সহজে হারিয়ে দেয় । সভ্য পোষাক, সভ্য ভাষা, সভ্য আচার ইত্যাদি গুণ বিনষ্ট হয় । কুলাচারের উপর কঠোর কুঠারাঘাত হয় । দিনরাত আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকার কারণে আচরণ ও বুদ্ধিমত্তার অভাব দেখা দেয়। এমন আসক্তিগ্রস্ত ব্যক্তি সব সময় ধর্ম থেকে দূরে চলে যায়। বারাঙ্গনা সর্বদা তার বশীভূত ব্যক্তিকে কৃত্রিম প্রেম, কৃত্রিম শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গি দিয়ে উত্তেজিত করে, যার কারণে আসক্ত লোকেরা অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ ও জীর্ণ হয়ে যায়। বেশ্যার প্রেম স্বার্থপর। যখন স্বার্থ হাসিল হয় না তখন সে জিজ্ঞেসও করে না।

বেশ্যাসক্তের পরিবারে আচার-আচরণে শুদ্ধতা থাকে না। তার বংশ বিনষ্ট হয়। বংশ বিনষ্ট না হলেও তার সন্তানদের পুণ্যবান হওয়া খুবই কঠিন। "

স্বামীজী আরো বললেন - " যুবকগণ ! আমাকে বলো তো বেশ্যাসক্তি থেকে যদি একটি মেয়ে জন্ম নেয়, তবে সেই মেয়েটি কার মেয়ে ? "

যুবকেরা বলল - "সেই বেশ্যাসক্ত পুরুষের।"

তারপর স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন - "সেই মেয়ে যুবতী হয়ে কি কাজ করবে?"

যুবক বলল - "সে আর কি করবে? সে বেশ্যা হয়ে বাজারে বসবে।"

তখন স্বামীজী মর্মস্পর্শী কণ্ঠে বললেন- “দেখো, পৃথিবীর কোনো ভালো মানুষ চায় না যে তার মেয়ে পতিতা হয়ে বাজারে বসুক, কিন্তু বেশ্যাদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তাদেরই মেয়েদের পতিতা বানায়, চৌরাস্তায় বসায় এবং তারা দ্বারে দ্বারে নাচায় । তোমারা চিন্তা করো এটা কি খুব খারাপ কিছু নয় ? "

এই উপদেশ শুনে কদাচারী যুবকের গায়ের লোম যেন দাঁড়িয়ে গেল। তার বিবেক কেঁপে উঠল নিজের করা পাপকর্মের জন্য । তার সারা শরীরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং সে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাথে বললো,

" স্বামীজী ! আপনার কথা সত্য । প্রকৃতপক্ষে, বেশ্যাসক্তি একটি জঘন্য কাজ । "

সেই নেশাগ্রস্ত যুবক স্বামীজীর পা ছুঁয়ে শপথ নিল যে আজ থেকে আমি পতিতাদের কাছে যাব না এবং যাদের রাখা হয়েছে তাদের ত্যাগ করব।

ভগবৎপাদ মহর্ষি দয়ানন্দ তাকে সাধুবাদ দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "সৌম্য ! তোমার জীবন ঈশ্বরের কৃপায় পবিত্র হোক এবং এই সময়ের এই তোমার বুদ্ধি চিরকাল বিদ্যমান থাকুক। "

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বিয়ে কি ৭ জন্মের বন্ধন ?

প্রশ্নঃ বিয়ে কি ৭ জন্মের বন্ধন ? যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তাঁর সাথেই কি অগ্নিসাক্ষী করে করা বিয়ে পরের জন্মেও থাকবে ?

উত্তরঃ না , বিয়ে ৭ জন্মের নয় বরং বর্তমান জন্মেরই বন্ধন । যারা আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তারা কী তবে পূর্বের জন্মগুলোতে বিয়ে করেননি ? কিংবা যারা এই জন্মে অবিবাহিত থাকবেন তারা কী তাহলে পরের জন্মেও অবিবাহিত থাকবেন ? যেখানে আমি এই জন্মের কর্মের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে মোক্ষ লাভ দূরের কথা মানবজন্মই লাভ করব কিনা তার নিশ্চয়তা নেই তবে বিয়ে ৭ জন্মের বা জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন কীভাবে সত্য হতে পারে ?

জীবাত্মাকে লিঙ্গ-রহিত —

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

য়দ্ য়চ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫.১০

সরলার্থঃ এই জীবাত্মা স্ত্রী নন, পুরুষও নন আবার নপুংসকও নন। যে যে শরীরকে ইনি গ্রহণ করেন, সেই সেই শরীর দ্বারা তিনি সংরক্ষিত হন।

জীবাত্মায় 'পুরুষভাব' অথবা 'স্ত্রীভাব' ইত্যাদির কোনো লক্ষণ নেই, বরং এই লক্ষণ জীবদেহে দেখা যায়। আত্মা যে শরীর ধারণ করেন, সেই শরীরের গুণ, কর্ম ও স্বভাবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হন। যে জীবাত্মা বর্তমান জন্মে পুরুষদেহ ধারণ করেছেন, তিনিই অন্য কোনো জন্মে স্ত্রীদেহ লাভ করতেই পারেন। অর্থাৎ পার্থিব শরীরের জন্যই স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক ইত্যাদি ভেদ পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে পিতা-পুত্রাদির সম্বন্ধও এই শরীরের সংযোগের কারণেই হয়। আমরা অবিদ্যায় লিপ্ত হয়ে, স্বয়ং শুদ্ধ জীবাত্মায় শরীরের গুণ বা স্বভাবকে আরোপ করি, এটিই দুঃখের মূল কারণ। যখন তত্ত্বজ্ঞানরূপ 'বিদ্যা' নামক সূর্যের উদয় ঘটে এবং 'অবিদ্যা' নামক আঁধারের নাশ হয়, তখন অধ্যাত্ম বিচারে তৎপর (পুরুষ অথবা স্ত্রী দেহধারী) জীবাত্মা স্ত্রী-পুরুষ ভাব রহিত হয়ে নিজের শুদ্ধ স্বরূপকে জেনে দুঃখ থেকে মুক্ত হন।

জীবাত্মার বিভিন্ন শরীর ধারণের কারণ উপনিষদ্ বলছেন—

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।

কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫.১১

সরলার্থঃ জীবাত্মা সংকল্প, স্পর্শ ও দৃষ্টির মোহ দ্বারা ভোগস্থানসমূহে (মনুষ্যাদি যোনিতে) নিজ কর্মানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয়। ক্রমানুসারে অন্ন-পানাদি ভোজন দ্বারা জীবের শরীরের বৃদ্ধি এবং জন্ম হয়।

সংকল্প, স্পর্শ ও দৃষ্টির মোহ দ্বারা বশীভূত জীবাত্মা বিভিন্ন যোনিতে শরীর ধারণ করে। সংকল্প-স্পর্শ-দৃষ্টি এর মোহ দ্বারা মনের প্রপঞ্চ কীভাবে বৃদ্ধি পায়? 'সংকল্প' এর সম্বন্ধ মনের সঙ্গে; 'স্পর্শ' ও 'দৃষ্টি' এর সম্বন্ধ মনের সাধন ত্বক্ ও চক্ষুর সঙ্গে। ত্বক্ ও চক্ষু দুটোই একে অন্যের কার্য চালাতে পারে। চক্ষু দর্শনে অসমর্থ হলে, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করেই কার্যসিদ্ধি করা হয়। অতএব, মনের প্রপঞ্চের বৃদ্ধি 'সংকল্প' ও 'দৃষ্টি' দ্বারা হয়। মনের চক্ষু 'সংকল্প', শরীরের চক্ষু 'স্পর্শ' ও 'দৃষ্টি'। যখন যথার্থ দৃষ্টি এসে যায়, তখনই তো মুক্তি লাভ হয়; আর দৃষ্টিতে মোহ এসে পড়লে, তখন সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে। এজন্য উপনিষৎকার ঋষি বলছেন— জীবের স্থূল-শরীরের বৃদ্ধি তো খাদ্য ও পানীয়ের সম্যক্ সেচন অর্থাৎ ভোজন দ্বারা হয়, কিন্তু মনের মধ্যে প্রপঞ্চ ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ 'যথার্থ দৃষ্টি' থাকে না, যখন সংকল্প-স্পর্শ-দৃষ্টি এর মোহ জীবকে ঘিরে ফেলে। 'যথার্থ দৃষ্টি' উৎপন্ন হওয়ার ফলে জীব মনের বন্ধন (বিষয়-বাসনা) থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

জীবাত্মার নানা যোনিতে গমনাগমনের কারণ শ্রুতি বলছেন—

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।

ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংয়োগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫.১২

সরলার্থঃ জীবাত্মা নিজের পুণ্য ও পাপময় গুণ অনুসারে স্থূল, সূক্ষ্ম অনেক প্রকার শরীর ধারণ করেন। আত্মার নিজের কর্মের গুণ ও নিজের স্বাভাবিক গুণের দ্বারা শরীরের সাথে সেই জীবাত্মার সংযোগের কারণ পরমাত্মাকেও সম্যক্ জানা যায়।

জীবাত্মা নিজের কৃত শুভ-অশুভ কর্মের কারণে স্থূল ও সূক্ষ্ম অনেক প্রকারের শরীর প্রাপ্ত হন। দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধ কী কারণে হয়েছে? এর উত্তরে ঋষি বলছেন, আত্মায় নিজের ক্রিয়া বা কর্মের যে গুণ এবং ক্রিয়ার অতিরিক্ত তার নিজের যে স্বাভাবিক আত্মগুণ থাকে, সেটিই শরীরের সাথে সংযোগের কারণ। যদিও জীবের শরীর ধারণের মূল কারণ পরমাত্মা; কেননা জীব কর্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু কর্মফল ভোগের ক্ষেত্রে পরতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। যদি জীব নিজের কর্মে স্বাধীন না হতো এবং তার নিজস্ব ইচ্ছা, দ্বেষ না থাকতো, তবে কী অপরাধে জীব বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করতো? তাই যদিও ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত নিয়মানুসারে জীব জন্মগ্রহণ করে, তবুও নিজের পাপ ও পুণ্যরূপ কর্মের প্রভাবে বিভিন্ন যোনিতে শরীর ধারণের কারণ জীবাত্মা নিজেই।

প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি মূলত বিয়ের গুরুত্ব, বৈবাহিক সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশে আতিশায্য । বিবাহ সাতটি জন্মের বন্ধন নয়, এটি আসলে দুটি হৃদয়ের মধুর আবেগের এক চিরন্তন গল্প। এটি কোনো শর্তের বা সময়ের বাঁধনে বাঁধা নয়, বরং এটি এক অমোঘ সম্পর্ক, যা অনুভূতির গভীরতা থেকে জন্ম নেয়। দুই জনের একে অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, যে ভালোবাসা কোনো সীমা বা সময়ের গণ্ডি জানে না। বিবাহ মানে শুধু একটি আইনি বা সামাজিক বন্ধন নয়, এটি হলো অনুভূতির এক অসীম স্রোত, যেখানে আবেগের তীব্রতা একে অপরকে অনুভব করতে শেখায়, একে অপরের কষ্টে বা আনন্দে শামিল হতে শেখায়। তাই, বিবাহ আসলে একটি জীবনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং সুন্দর অনুভূতির চিত্র, যা জন্ম নেয় শুধুমাত্র প্রেম ও বিশ্বাসের ভিতর।

বিবাহ সাতটি জন্মের বন্ধন নয়,
এটি তো একটি আবেগের স্নিগ্ধ নদী,
যার তরঙ্গে মিশে থাকে দু'টি প্রাণের সুর,
যারা একে অপরকে ভালোবাসে,
কেবল এই মুহূর্তে,
কেবল এই জীবনে।
বন্ধন নয়, এটি তীব্র অনুভূতির রাগ,
যা হৃদয়ে বেজে ওঠে,
যেখানে কোনো সময় নেই,
কেবল একে অপরের পাশে থাকা,
কেবল প্রেমের গভীরতা।

অনেকে বলতে পারেন, এই কথা বলা উচিত নয় কেননা এতে বৈবাহিক সম্পর্কের মাহাত্ম্য হ্রাস পাবে । প্রকৃতপক্ষে ধারণাটি ভুল, কেননা বিবাহের ন্যায় পবিত্র সংস্কার বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নয় । আর যদি বিবাহিত নারী-পুরুষরাই ধর্মীয় ভিত্তিস্বরূপ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী থাকেন তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম কী শিখবে ? তাই আমাদের উচিত ধর্মীয় ভিত্তিগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বৈদিক শাস্ত্রে মৃতদেহ দাহের উল্লেখ আছে নাকি সমাধির ?

সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বেদ - বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্ [মনুস্মৃতি ২।৬]। শাস্ত্রে বারংবার বলা হয়েছে বেদানুকূল সিদ্ধান্তই ধর্ম ও তদ্বিরীত অধর্ম - "ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"[মনুস্মৃতি ২।১৩] অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চায় তার জন্য বেদই মূখ্য প্রমাণ। বেদ স্বয়ং সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর দ্বারা প্রদত্ত, ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ [গীতা ৩।১৫] = বেদ স্বয়ং ঈশ্বর হতে প্রকাশিত। এখানে আস্তিক সনাতন ধর্মালম্বী মাত্রে বেদের বিধান মানতে বাধ্য কারণ "নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্।" [সাংখ্য দর্শন ৫।৫১] = ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বেদরূপে প্রকাশিত বলে বেদ স্বতঃপ্রমাণ। ব্রহ্মসূত্রে "শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ" [ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩] তে তথা "অতএব চ নিত্যত্বম্"[ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৯] ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমেশ্বরকে ঋগ্বেদাদি রূপ সর্ব জ্ঞানের কর্তা মেনে বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। যদি আপনি শাস্ত্রীয় কর্মে কোন প্রকার অনুশাসন কিংবা বিধানের পরামর্শ দিতে চান আপনাকে শাস্ত্রমর্যাদার ক্রমানুসারে চলতে হবে - আপনি বাধ্য এই ক্রম চলতে, এটাই দর্শন থেকে গীতা সর্বশাস্ত্রের সর্বতন্ত্র সর্বপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত ।

মৃতদেহ দাহই শ্রুতিসম্মত । যজুর্বেদের ৪০তম অধ্যায়ের ১৫শ মন্ত্রে বলা হয়েছে -

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঽম্ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর॥

যজুর্বেদ ৪০।১৫

সরলার্থঃ হে কর্মশীল জীব! তুমি শরীর ত্যাগ করার সময় 'ওঽম্' – এই নামবাচ্য ঈশ্বরকে স্মরণ করো, নিজের সামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য পরমাত্মা ও নিজের স্বরূপকে স্মরণ করো, নিজের কৃতকর্মকে স্মরণ করো। এখানে (এই শরীরে) বিদ্যমান ধনঞ্জয়াদিরূপ বায়ু কারণরূপ বায়ুকে, আর কারণরূপ বায়ু অবিনাশী কারণকে (প্রকৃতিকে) ধারণ করে। অতঃপর এই নশ্বর শরীর অন্তে ভস্মে পরিণত হয়— এরূপ জানবে।

ভাবার্থ হলো, মনুষ্যগণের উচিত যে, যেমন মৃত্যুর সময়ে চিত্তের বৃত্তি হয়ে থাকে এবং শরীর থেকে আত্মার পৃথক ভাব হয়, ওইরূপ চিত্ত-বৃত্তি এবং শরীর ও আত্মার সম্বন্ধকে জীবনকালেও জানবে। মৃত্যুর পর এই শরীরের ভস্মান্ত-ক্রিয়া করবে। এই দাহক্রিয়ার পরে মৃতের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো সংস্কার পালন করা নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে (জীবনকালে) এক পরমেশ্বরেরই আজ্ঞা পালন, উপাসনা এবং স্বীয় সামর্থ্যের বৃদ্ধি করবে। কৃতকর্ম কখনো নিষ্ফল হয় না, এরূপ জেনে ধর্মে রুচি এবং অধর্মে অপ্রীতি করতে থাকবে।

"ভস্মান্ত□ শরীরম্" (যজু০ ৪০।১৫)॥ এই শরীরের সংস্কার (ভস্মান্তম্) অর্থাৎ ভস্ম করা পর্যন্ত (সংস্কারবিধি, অন্ত্যেষ্টিকর্ম)।

মৃত্যুর সময় কী করা উচিত— কর্মশীল জীব দেহান্ত অর্থাৎ শরীর ত্যাগের সময়, 'ওঽম্' – পরমেশ্বরের এই মুখ্য নামের স্মরণ করবে। স্বীয় সামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য পরমাত্মা এবং নিজের স্বরূপকে স্মরণ করবে। যা কিছু জীবনে করেছে, সেই সব কৃতকর্মকে স্মরণ করবে। এই শরীরের মধ্যে স্থিত ধনঞ্জয়াদি বায়ু, কারণরূপ সূক্ষ্ম বায়ুর ওপর আশ্রিত এবং কারণরূপ সূক্ষ্ম বায়ু, অবিনাশী কারণের (প্রকৃতির) ওপর আশ্রিত। শরীর থেকে আত্মার পৃথক ভাব উক্ত বায়ুর ওপর আশ্রিত। শরীর থেকে আত্মার পৃথক ভাব অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে যেরূপ চিত্তবৃত্তির কথা বলা

হয়েছে, ওইরূপ চিত্তবৃত্তি মানুষকে জীবনকালেও রাখতে হবে। দেহান্তের (মৃত্যুর) পরে এই শরীরের ভস্মান্ত-ক্রিয়া (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) করবে। ভস্মান্ত-ক্রিয়ার পরে মৃত ব্যক্তির জন্য আর কোনো সংস্কার, কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ জীবনকালে এক পরমেশ্বরেরই আজ্ঞা পালন, তাঁর উপাসনা এবং নিজের সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করবে। কৃতকর্ম কখনো বিফল হয় না, এরূপ জেনে ধর্ম মধ্যে রুচি এবং অধর্মে অপ্রীতি রাখবে॥।

এই শ্রুতিতে দুটি কথা বলা হয়েছে— (ক) ভস্মে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে এই শরীরের অন্ত হয় এবং (খ) মৃত্যুর সময় ঈশ্বরের মুখ্য নাম ‘ওঽম্’ এবং নিজের কৃতকর্মকে স্মরণ করবে। এখন বিচার করা যাক 'ভস্মে পরিণত করার মাধ্যমে শরীরের অন্ত করা উচিত'—

আত্মা অবিনশ্বর, শরীর নশ্বর। আত্মা নিত্য, শরীর অনিত্য। এই নশ্বর শরীরের প্রতি মোহ করা উচিত নয়, কারণ এটি একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। এই শরীরে স্থিত নাগ, কৃকল, কূর্ম, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়াদি বায়ু তাদের কারণরূপ সূক্ষ্ম বায়ুকে আশ্রয় করে এবং এই কারণরূপ সূক্ষ্ম বায়ু যখন মূল-প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই এই শরীর অসার হয়ে পড়ে। তখন এই শরীরের কোনো মূল্যই থাকে না। তখন শরীরকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোক কিংবা ছিন্ন-ভিন্ন করা হোক, কোনো কিছুতেই এই শরীরের যায় আসে না। কিন্তু সেই শরীরের সাথে কীরূপ ব্যবহার করা উচিত, সে বিষয়ে উপনিষদের নির্দেশনা আছে। সেজন্য উপনিষদ্ বলছে— মৃত ব্যক্তির দাহকর্মের মাধ্যমে তার শেষ ক্রিয়া (অন্তিম সংস্কার) সম্পন্ন করবে। যদি মৃতদেহকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় অথবা কোনো স্থানে ফেলে রাখা হয়, তা রোগ-জীবাণু সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, মৃতদেহকে বিধিপূর্বক অগ্নিতে ভস্মীভূত করে পঞ্চভূতে বিলীন করা উচিত।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে দাহ করলে কেউ অশুদ্ধ হয় না অথবা কারো অশৌচ হয় না। এটি ঋষিসম্মত বৈদিক সিদ্ধান্ত। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম লিখেছেন- "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ" (৩।১।৪) অর্থাৎ মৃতদেহ দাহ করলে পাতকাদি দোষ লাগে না। বরং এটি পুণ্য কর্ম, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫।১১।১) আছে-

এতদ্বৈ পরমং তপো য়ং প্রেতমরণ্যং হরন্তি ।

এতদ্বৈ পরমং তপো য়ং প্রেতমপ্নাবভ্যাদধতি ॥

অর্থাৎ মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যাওয়া এবং দাহ করা পরম তপস্যা। এজন্য এর নাম সৎকার।

সুতরাং মৃতদেহ দাহই একমাত্র ও সর্বমান্য সিদ্ধান্ত ।

কতিপয় ব্যক্তি মনুস্মৃতির শ্লোক প্রদর্শন করেন শিশুদের সমাধি দেওয়ার জন্য । উক্ত শ্লোক শ্রুতি বিরোধী বিধান অপ্রামাণিক। কেননা যেখানে শ্রুতির প্রত্যক্ষ আদেশ বিদ্যমান সেখানে স্মৃতিবাক্যে অনুমানের বা বিকল্পের কোন অবকাশ নেই।

অথর্ববেদের ১৮শ কাণ্ডের কিছু মন্ত্রদ্বারা অনেকেই সমাধি নির্দেশ আছে বলে নির্দেশ করেন। যথা -

যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ ।

সর্বাস্তানগ্ন আ বহ পিতৃন্হবিষে অত্তবে॥

অথর্ববেদ ১৮.২.৩৪

এখানে,

নিখাতাঃ = ভূমিতে প্রোথিত, পরোপ্তাঃ = ভাসিয়ে দেওয়া, দগ্ধাঃ = জ্বালানো, উদ্ধিতাঃ = নিক্ষিপ্ত ~ এই চার প্রকার মৃতের সংস্কার আছে বলে অনেকে দাবি করেন। এখন মন্ত্রের শেষভাগে "সর্বাস্তানগ্ন আ বহ পিতৃন্হবিষে অত্তবে" = সবাইকে অগ্নি অন্ন গ্রহণে নিয়ে আসুক - এতে আপত্তি নেই । আসুন বাকিগুলো দেখি। গীতা ২.২৩-২৪ অনুযায়ী,

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২.২৩

অর্থ: এই (আত্মাকে) অস্ত্রসকল ছেদ করতে পারে না, আগুন একে পোড়াতে পারে না, জল একে ভিজাতে পারে না, বাতাস একে শুকাতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২.২৪

অর্থ: এই আত্মা অচ্ছেদ্য, এই আত্মা অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং নিঃসন্দেহেই অশোষ্য। এই আত্মা নিত্য, সর্বগত, স্থির, অটল, সনাতন।

শব্দার্থ হলো, অচ্ছেদ্য = কাটা যায় না। অদাহ্য = পুড়িয়ে দেওয়া যায় না। অক্লেদ্য = জলে ভেজানো যায় না। অশোষ্য = শুকানো যায় না।

উক্ত অথর্ববেদীয় মন্ত্রের পৌরাণিক অর্থ জীবাত্মার বেলায় প্রযোজ্য হবে না কেননা জীবাত্মাকে দগ্ধ, প্রোথিত করা যায় না । যজুর্বেদ ৪০.১৫ অনুযায়ী দাহসংস্কারই একমাত্র সংস্কার মৃতদেহের, ৪ প্রকারপদ্ধতির প্রশ্নই আসে না । যদি বলেন এটা জীব তথা দেহকে বলা তাহলে পরের অর্ধেক বৃথা কেননা দেহকে তো আর কেউ ডেকে আনতেও পারবে না ও দেহ আসেও না । যদি বলেন জীবদেহ ও আত্মা উভয়কে বলা তবে তা আর মৃতের শ্রাদ্ধ হলো কীভাবে ? কারণ দেহে আত্মা থাকলে সে তো জীবিতই ।

এখানে নিখাত - ভূগর্ভবিদ্যা পণ্ডিত, উদ্ধিত - ভূপৃষ্ঠ ও আকাশমার্গবিদ্ তথা খনিজ পদার্থ বহির্গতকারী পণ্ডিত, দগ্ধ - অগ্নিবিদ্যার পণ্ডিত পরোপ্ত - জলযান পণ্ডিত এই অর্থই যথাযথ ও বেদের প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ করে । যেভাবে স্নাতক অর্থ স্নান করা ব্যক্তি হলেও মূল লক্ষ্য হলো, গুরুকুল থেকে সমাবর্তনে স্নান করা বিদ্যার্থী এখানেও তেমনই ভাবে গ্রহণ করতে হবে ।

মনুস্মৃতি ৩.১৯৯ অনুযায়ী অগ্নিদগ্ধ ও অনগ্নিদগ্ধ কবি পুত্র এবং বর্হিষদ অগ্নিষ্বাত্ত সৌম্য ব্রাহ্মণদের পিতর । এখানেও এই পিতরদের অর্থ জ্বালানো হতে পারে না । এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তা প্রমাণ করা যায় । কেননা কোথাও এই অর্থ নেই । মহাভারত বনপর্ব ৫০.৫ "সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তথা" অনগ্নি ও সাগ্নি ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, এরা কেউ মৃত না । তাই মনুস্মৃতির উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত । বনপর্বের ২৪.১৪-১৫ অনগ্নিকে নিরগ্নি ও সাগ্নিকে সাগ্নিহোত্র বলা হয়েছে । অর্থাৎ গীতা ৪.৩৩ অনুযায়ী যথাক্রমে জ্ঞানযজ্ঞ ও দ্রব্যযজ্ঞের যাজ্ঞিক এরা ।

অন্যদিকে ঋগ্বেদ ১০।১৫।১১-তে অগ্নিষ্বাত্তাঃ পদ দ্বারা এবং ঋগ্বেদ ১০।১৮।১০-১৩ সম্পর্কে সমাধির যে উল্লেখ করা হয় তাও ভ্রান্ত। অগ্নিষ্বাত্তাঃ পদের অর্থ সায়ণ করেন 'অগ্নিনা স্বাদিতা' অর্থাৎ যাদের দাহ করা হয়েছে। একই তথাকথিত প্রামাণিক সায়ণভাষ্যে ১০ম মন্ত্রের ভাষ্য মৃতদেহকে ভূমির উপরে রাখার উল্লেখ আছে, নিচে নয় 'অস্মাভির্ভূমৌ নিধীয়মানস্ত্বম্ উপ সর্প উপগচ্ছ'। মনুস্মৃতির ৪।২৪১ শ্লোকেও দেখা যায় মৃতদেহ ভূমিতলে (প্রচলিত

বাংলায় আবার ভূমির তলে মানে নিচে ভাববেন না, এটা স্বাভাবিক ভাষাজ্ঞান, তল মানে পৃষ্ঠ) অর্থাৎ ভূমিপৃষ্ঠে পরিত্যাগের উল্লেখ আছে, পুঁতে ফেলা নয়। শুধু তাই নয়, ১০-১৩ মন্ত্রে মৃতের অস্থিকে ভূমিতে প্রোথিত করার উল্লেখ করেছেন সায়ণ, মৃতদেহকে নয়।

১০ম মন্ত্র - ত্বামস্থিরূপং যজমানং পাতু রক্ষতু

১১শ মন্ত্র - এনম্ অস্থিরূপং যজমানং ত্বম্ অভি

১২শ মন্ত্র - অস্থিকুম্ভমবষ্টভ্যোর্ধ্বং

১৩শ মন্ত্র - অস্থিকুম্ভ ত্বৎপরি

অর্থাৎ একটি মন্ত্রের প্রচলিত ভাষ্যেও মৃতদেহ সমাধির কোন উল্লেখই নেই বরং মৃতদেহ দাহের পর বিদ্যমান অস্থিকে মাটিতে প্রোথিত বা পুঁতে ফেলার নির্দেশ আছে । একই বিধান আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।৫।৬-৮ সম্মতও বটে। এই কথা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও বলেছেন সংস্কারবিধির অন্ত্যেষ্টিপ্রকরণে,

" তারপর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে মৃতকের কোন আত্মীয় শ্মশানে গিয়া চিতা হইতে অস্থি উঠাইয়া সেই শ্মশানভূমিতে কোথাও সেগুলি পৃথকভাবে রাখিয়া দিবে। "

সুতরাং ঋগ্বেদোক্ত উক্ত মন্ত্রসমূহে সমাধির প্রমাণ নেই।

মনুস্মৃতি ৫।৬৮-৭০ অনুযায়ী যার বয়স ২ বছরের কম তাকে দাহ না করে সমাধি দিতে হবে। প্রথমত উক্ত বিধান বেদবিরোধী, তাই অমান্য। দ্বিতীয়ত ৭০ শ্লোকে ৩ বছরের কম বালকের উল্লেখ আছে, যদি ৬৮ শ্লোকে ২ বছরের কম উল্লেখ করাই হয় তবে আবার নতুন করে ৩ বছরের কমের উল্লেখ কেন? কোনটি তাহলে স্বীকার্য? পাশাপাশি, ৬৯ শ্লোকে ত্রিরাত্র অশৌচের উল্লেখ আছে, অথচ অন্য সর্বত্র [যেমন মনু০ ৫।৮৩] চারবর্ণের জন্য পৃথক অশৌচের নির্দেশ বিদ্যমান, যা পরস্পর স্পষ্ট বিরোধী। পাশাপাশি ৭০ শ্লোকে যদি দাঁত না হয় বা নামকরণ হয় তবে উদকক্রিয়া করা যেতে পারে বলা হয়েছে। নামকরণ পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১.১৭.১ অনুযায়ী জন্মের পর ১১শ দিনে করণীয়। তাহলে তো ২ হোক বা ৩ সবারই উদকক্রিয়া করা সম্ভব, দাহেরও বিধি হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় উক্ত শ্লোকত্রয় সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য ও বেদবিরোধী বিধায় প্রক্ষিপ্ত।

সন্ন্যাসীর দেহ যে দাহ না করার বিধি এটি মূলত তন্ত্রোক্ত ও পুরাণে কথিত। মহানির্বাণতন্ত্রের ৮ম উল্লাসের ২৮৪ শ্লোকে বলা হয়েছে,

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।

সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদৈঃ নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ, সন্ন্যাসীর দেহ কখনোই দাহ করবেনা, বরং গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চিত করে ভূমিতে প্রোথিত করবে বা জলে ডুবিয়ে দেবে।

অতঃ বৈদিক বিধানে মৃতদেহ মৃৎ বা জল সমাধির বিধান কখনোই দৃষ্ট হয়না। তা তান্ত্রিক ও পৌরাণিকদের আদরণীয় হলেও বেদানুকূল ভক্তবৃন্দের অবশ্য পরিত্যাজ্য ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মহর্ষিস্তবঃ - অষ্টকম্

একোঽপি সন্ নির্ভয়বীরবর্যঃ,

সমস্তপাখণ্ডমখণ্ডয়দ্ যঃ।

সত্যব্রতশ্রেষ্ঠমমুং মহান্তম্,

ঋষিং দয়ানন্দমহং নমামি ॥১॥

ভাবার্থানুবাদ: যেই নির্ভীক বীরবর একাকী সর্ব পাষণ্ডমত খণ্ডন করেছেন, সেই সত্যব্রতধারী শ্রেষ্ঠ মহান ঋষি দয়ানন্দকে আমি নমস্কার করি।

ন যং কৃতান্তোঽপ্যশকদ্ বিজেতুং,

যস্যাগ্রতো বদ্ধকরঃ স তস্থৌ।

যোগাগ্নিনা দগ্ধসমস্তদোষম্,

ঋষিং দয়ানন্দমহং নমামি॥২॥

ভাবার্থানুবাদ: মৃত্যু বারংবার সমাগত হয়েও জয় করতে পারেনি যাকে, বরং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলো, যিনি যোগাগ্নি দ্বারা সর্বদোষ দগ্ধ করেছেন এমন ঋষি দয়ানন্দকে আমি প্রণাম করি।

বিষং প্রদায়াপ্যপকারকর্ত্রে,

যোঽদাদ্ ধনং তস্য হি রক্ষণার্থম্।

প্রেম্ণা স্বশত্রূনপি মোহয়ন্তম্,

ঋষিং দয়ানন্দমহং নমামি॥৩॥

ভাবার্থানুবাদ: ক্ষতিকারী বিষদাতাকেও যিনি জীবনরক্ষায় ধন দান করেছিলেন, প্রেমের মাধ্যমে শত্রুদেরও যিনি মোহিত করতে এমন ঋষি দয়ানন্দকে আমি নমস্কার করি।

যদ্যঙ্গুলীরপ্যরয়ো দহেয়ুস্তথাপি যাস্যামি ন তত্র চিন্তা।

ইত্যাদিবাক্যং সমুদাহরন্তং, তং শ্রীদয়ানন্দমহং নমামি॥৪॥

ভাবার্থানুবাদ: যদি বিরোধীরা আমার আঙুল জ্বালিয়ে দিলেও আমি সত্য প্রকাশ করে যাবো - এমন বক্তা মহর্ষি দয়ানন্দকে আমি নমস্কার করি।

দয়ায়া যঃ সিন্ধুর্নিগমবিহিতাচারনিরতো,

বিলুপ্তং সদ্ধর্ম, পুনরপি সমুদ্ধর্তুমনিশম্।

দিবারাত্রং যেতে, যতিবরগুণগ্রামসহিতো,

দয়ানন্দো যোগী, বিমলচরিতোঽসৌ বিজয়তে॥৫॥

ভাবার্থানুবাদ: যিনি দয়ার সাগর ছিলেন, বেদ প্রতিপাদিত আচরণে তৎপর্য ছিলেন, বিলুপ্ত সদ্ধর্মের রক্ষার জন্য দিবারাত্রি প্রচেষ্টা করতেন এমন শুদ্ধচরিত যতিবর যোগী দয়ানন্দের জয় হোক।

যদীয়ং বৈদুষ্যং, শ্রুতিবিষয়কং লোকবিদিতং,

যদীয়ং যোগিত্বং, কলিযুগজনেষ্বস্ত্যনুপমম্।
হিতার্থং সর্বেষাম্, ইহ নিজসুখং যস্তু বিজহৌ,
দয়ানন্দো যোগী, বিমলচরিতোঽসৌ বিজয়তে॥৬॥

ভাবার্থানুবাদ: যার বেদবিদ্বতা লোকখ্যাত, যার যোগীত্ব কলিযুগে অনুপম, সর্বহিতার্থে যিনি নিজের সুখ ত্যাগ করেছিলেন, এমন বিমল চরিত্রের অধিকারী যোগী দয়ানন্দের জয় হোক।

স্বরাজ্যং সরবেভ্যঃ, পরমসুখদং শান্তিজনকং,
স্বদেশীয়ো ধার্যঃ, সকলমনুজৈর্বস্ত্রনিবহঃ।
স্বরাষ্ট্রং চারাধ্যং, দিশিদিশি দিশন্ ভীতিরহিতো,
দয়ানন্দ যোগী, বিমলচরিতোঽসৌ বিজয়তে॥৭॥

ভাবার্থানুবাদ: "স্বরাজ্যই পরম সুখ ও শান্তিদাতাব, সবার উচিত স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করা। এভাবে নিজ রাষ্ট্রের সেবা করা উচিত" - নির্ভয় হয়ে সর্বদিকে যিনি শুভ মনোভাবের প্রচার করেছিলেন, এমন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী যোগী দয়ানন্দের জয় হোক।

জনাঃ সর্বে নূনং, ভুবনজনিতুঃ পুত্রসদৃশাঃ,
অতোঽন্যোন্যং স্নেহঃ, সকলমনুজানাং সমুচিতঃ।
ন কোঽপ্যস্পৃশ্যো না, ইতি বিলমভাবং প্রচুরয়ন্,
দয়ানন্দো যোগী, সরলহৃদয়োঽসৌ বিজয়তে ॥৮॥

ভাবার্থানুবাদ: সংসারের সব মানুষ একই জগৎস্রষ্টা পরমাত্মার সন্তানের মতো, এজন্য পরস্পরে প্রেমই কাম্য, অস্পৃশ্য কেউই নয় ~ এমন পবিত্র ভাবের প্রচারক সরল হৃদয় যোগী দয়ানন্দের জয় হোক।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বিধবাবন্ধু ~ আর্যসমাজ দ্বারা প্রকাশিত বিধবাবিবাহের একমাত্র সমর্থক পত্রিকা

বিধবাবন্ধু ১৯২৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। লাহোরের বিধবাবিবাহ সহায়ক সভা এবং স্যার গঙ্গারাম ট্রাস্ট সোসাইটির দ্বারা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়। এটি ছিলো একটি মাসিক পত্র। ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত দীনানাথ সিদ্ধান্তালঙ্কার। ১৯৩০ সালে মেহতা শান্তিস্বরূপ বিদ্যালঙ্কারের হাতে সম্পাদনার ভার অর্পিত হয়। পত্রিকার মুখ্য পৃষ্ঠায় মনুস্মৃতির [৩।৫৬] শ্লোক লেখা ছিলো -

যত্র নার্য়স্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ, যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেই সমাজ দিব্য গুণ তথা দিব্য ভোগ (উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি) লাভ করে। আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়।

পত্রিকাটিতে নারীদের নানা সমস্যা, বিশেষভাবে বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা হতো। প্রকাশিত হতো নারীদের নিয়ে নানা প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কাহিনী ও কবিতা। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের সংখ্যায় মোহন লাল মুহিয়ালের কাব্য প্রকাশিত হয়, নাম ছিলো 'ফরিয়াদে বেবা' অর্থাৎ 'বোবার অভিযোগ'। উর্দুতে প্রকাশিত মুসদ্দস ছন্দে লেখা কবিতার কিছু পংক্তি -

অজব দুখ দর্দ সহতী হূঁ গমোং মেং নীমজাং হোকর ।
টপকনে খূন কে আংসূ ইন আঙ্খোং সে রবাং হোকর ॥
সিধারে প্রাণপত ডেরা জমায়া পাস হসরত নে ।
বিসারী সুধ গুলিস্তাং কো উনহোংনে বাগবাং হোকর ॥

অর্থাৎ, দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে কী অদ্ভুত দুঃখই না সহ্য করছি। চোখ থেকে জীবন্ত হয়ে যেন টপ টপ করে রক্তের অশ্রু ঝড়ে পড়ছে। কতো আশাই না জমা হয়েছে এই বুকে । দেখো, কীভাবে বাগানের মালী ফুল পরিচর্যা করছে নিজেকে ভুলে গিয়ে।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়ার ক্ষতি, মাদ্রাজ অঞ্চলে বিধবাবিবাহ হওয়ার পক্ষে উদ্ভূত সমস্যা প্রভৃতি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রাগুক্ত সর্বশেষ নিবন্ধটি পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত দীনানাথ সিদ্ধান্তালঙ্কারের। পত্রিকাতে বিবাহযোগ্য বিধবার বিবরণ তথা দেশেরর নানা স্থানে অবস্থিত বিধবাশ্রমের বিবরণও নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হতো। বলা বাহুল্য, উক্ত পদ্ধতিতে বহু অসহায় বাল্যবিধবাদের নতুন করে বিবাহ সংস্কার ও নবজীবনের প্রারম্ভ শুরু করতে পত্রিকাটি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যখন একজন ইংরেজ অফিসার মহর্ষি দয়ানন্দ জীর বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন – কেমন ছিলো সেই বক্তৃতাটি

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ৩রা জুলাই ১৮৭৯ সালে, আলীগড় থেকে প্রতারিত হয়ে মুরাদাবাদ পৌঁছায়। তখন তাঁরা রাজা জয়কৃষ্ণ দাসের কক্ষে পৌঁছান। কিছুদিন আগে রোগমুক্ত হওয়ার কারণে মুরাদাবাদে কেবল তিনটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

ওই সময় মুরাদাবাদের যুগ্ম মেজিস্ট্রেট ছিলেন মিস্টার স্পীডিং। এটি অত্যন্ত রুচিবোধক কথা যে, এই ব্রিটিশ অফিসার কেবল মহর্ষিজীর বক্তৃতার জন্য মন স্থির করেন নি, বরং তার সম্পুর্ন ব্যবস্থাও নিজে করেছেন। এই বক্তৃতা মুরাদাবাদ ক্যাম্প স্থিত হলুদ কক্ষে হয়েছিলো। বক্তৃতার বিষয় ছিলো "রাজনীতি"।

শ্রোতাদের আমন্ত্রিত করার ব্যবস্থাও ম্যাজিস্ট্রেট স্পীডিং করেছিলেন। বক্তব্য শোনার জন্য কেবল বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে ডাকা হয়েছিলো। এই সভাটিতে নগরের প্রতিষ্ঠীত ব্যাক্তিবর্গ, সহকারী অফিসার, প্রতিনিধি, এবং অন্য গণ্যমান্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩০০ ।

মহর্ষি জী বক্তৃতা শুরু করেছেন " শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ " ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রের সুমধুর এবং গম্ভীর স্বরের উচ্চারণের দ্বারা। এই মন্ত্রো উচ্চারণের সমগ্র সভা শান্তি এবং ভক্তিতে ডুবে ছিলো। ভবনটিতে বেদ মন্ত্রের দিব্য স্বরে প্রতিধ্বনি হয়ে উঠলো। শ্রোতাদের অনুভব হলো যে, সংসারের সমস্ত সংগীত বিদ্যার মূল হলো 'বেদ'।

শ্রোতারা খুব মনযোগ সহকারে মহর্ষির জীর বক্তৃতা শুনছিলো। স্বামী জী বেদ এবং আর্ষ গ্রন্থের আধারের উপর রাজনীতির সিদ্ধান্তের বিশ্লেষন করেছেন। উনার তর্কপূর্ণ এবং যৌক্তিক প্রকারের প্রস্তুত করা বিষয়, শ্রোতাদের জন্য চমকপ্রদ ছিলো।

শ্রোতারা প্রথম বার অনুভব করেছে যে, একজন সন্ন্যাসী যিনি কেবল সংস্কৃতেই পারদর্শী , তিনি রাজনীতির গূঢ় তত্ত্বের এমন উৎকৃষ্ট বিবেচনা কিভাবে করতে পারেন! এটি তাদের জন্য নতুন এবং অপ্রত্যাশিত ছিল। এমন সমালোচনা তিনি কোনো শিক্ষিত ইংরেজ ব্যাক্তির নিকট হতে শোনেননি আর না কখনো ইংরেজি পুস্তক হতে পড়েছেন।

মহর্ষি জীর বক্তৃতা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত চলে এবং শ্রোতা সকলে পূর্ণ দৃঢ়তায় শুনেছেন। এই প্রকারে স্বামীজী শিকারের অপব্যবহারের খন্ডন করেছেন। এটিই জেনে যে, মিস্টার স্পীডিংগ শিকারে আগ্রহ রাখে।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর মিস্টার স্পীডিং উঠে দাঁড়ায় এবং মহর্ষি জীর অনেক প্রশংসা করেন। তিনি বলেছেন – স্বামীজী যে কথা গুলো নিজের বক্তব্যে প্রস্তুত করেছেন, যদি কোনো রাজা এবং প্রজা উনার অনুরূপ আচরণ করতো তাহলে বিপ্লবের সময় ওদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা আর সহ্য করতে হতো না। স্বামী জীর এই বিচারটি সত্য, এখানে কোনো সংশয় নেই।

তারপর তিনি স্বামীজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এবং সভা সমাপ্ত হয়েছে।

প্রফেসর রাজেন্দ্র 'জিজ্ঞাসু' এই বক্তৃতার টিপ্পনীতে লিখেছেন : –

"তৎকালীন ধর্মাচার্যো সংস্কারকের মধ্যে কারোর ভাষনের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কোনো শ্বেতাঙ্গ এই প্রকার নিজের গৃহ করিয়েছেন, এমন উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু কঠিন অবশ্যই। ওই সময়ের অধিকতর সংশোধক ধর্মাচার্য ছিলেন সরকার ভক্ত, এবং ঋষিরা ছিলেন প্রচন্ড দেশপ্রেমিক। এই বক্তব্যের বিশেষতাই ছিলো এটির বিষয় । ইংরেজদের গুহায় গিয়ে তাদের গৃহে "রাজধর্ম" বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া স্বামী দয়ানন্দ জীর বিচার এবং সাহস, দুটোই জ্বলন্ত উদাহরণ ।

[উৎস: বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডা. ভবনীলাল ভারতীয়, পণ্ডিত লক্ষণ জীর দ্বারা রচিত, মহর্ষি দয়ানন্দের জীবন চরিত্র]

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন এবং কার্যের প্রমুখ বিশেষতা

1. পরম্পরাগত শৈব এবং ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়ার পরেও, কেবল চতুর্দশ বর্ষের আয়ুতে মূর্তিপূজার অপূর্ণতা বুঝে যাওয়া এবং এর থেকে পূর্ণরূপে বিরক্তি হয়ে যাওয়া।

2. নিজ ভগ্নি এবং কাকার মৃত্যুকে দেখে জীবন এবং মৃত্যুর বিষয়ে গম্ভীর চিন্তন করা এবং যুবাবস্থায় বৈরাগ্যের ভাবকে ধারণ করে গৃহত্যাগ করা।

3. মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যোগের আবশ্যকতাকে জানেন এবং প্রকৃত শিব বা ঈশ্বরের দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করার সংকল্পের সহিত অনেক বর্ষ পর্যন্ত উচ্চ কোটির যোগী এবং বিদ্যাগুরুদের অন্বেষণের জন্য নিরন্তর কষ্টসাধ্য যাত্রা করা।

4. মধুরায় স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর মতো অদ্ভুত প্রজ্ঞাচক্ষু এবং জ্ঞানী বৈকারণের নিকট পৌঁছানো, এবং ৩৫ বর্ষের আয়ুতে একজন সন্ন্যাসী হয়েও একজন নিয়মিত শিক্ষার্থীর রূপে তাঁর নিকট থেকে অষ্টাধ্যায়ী, মহাভাষ্য আদি গ্রন্থের অধ্যয়ন করা।

5. নিজ গুরুর ইচ্ছার অনুসারে নিজের সম্পূর্ণ জীবনকে বৈদিক ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন৬,আর্ষ গ্রন্থের উদ্ধারের জন্য এবং পাখণ্ড মতসমুদায়ের তথা অনার্ষ নবীন গ্রন্থের অবিদ্যা অন্ধকারকে দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তা সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং পুরুষার্থ সহিত পালন করা।

6. অনেক বর্ষ পর্যন্ত ছোট-বড় গ্রাম, নগর এবং তীর্থের স্থানে পায়ে হেঁটে ধর্মপ্রচার করা, অন্ধবিশ্বাস এবং পাখণ্ডের নির্ভীকতার সহিত খণ্ডন করা এবং নিজ নাম প্রসিদ্ধ করা।

7. কুম্ভ আদি মেলায় উপস্থিত হয়ে পাখণ্ড মত সমুদায়ের খণ্ডন করা এবং বেদ ধর্মের ব্যাখ্যা করা।

8. কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সাথে অসংখ্য পৌরাণিক ব্যক্তিদের মধ্যে মূর্তিপূজার মতো বিষয়ে একাই শাস্ত্রার্থ করা এবং ইহা সিদ্ধ করা যে, বেদে মূর্তিপূজার কোনো স্থান নেই।

9. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজ প্রতিপক্ষী বিদ্বানদেরকে শাস্ত্রার্থের জন্য বার বার আহ্বান করা।

10. পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক গ্রন্থ সমূহের উপরান্ত জৈন, খ্রীষ্টান, ইসলাম আদি মত পথের মান্য গ্রন্থ সমূহকে পঠন করা, জানা এবং সেগুলোর মিথ্যা বচনের উন্মুক্ত খণ্ডন করা।

11. সমগ্র দেশে নিরন্তর যাত্রা করা এবং অধিকাধিক জনতা পর্যন্ত নিজের বচন পৌঁছানোর জন্য শাস্ত্রচর্চা, প্রশ্নোত্তর, সংবাদ, শাস্ত্রার্থ এবং প্রবচন করতে থাকা।

12. "সত্যার্থ প্রকাশ" এর মতো অনেক গ্রন্থের রচনা করা এবং আর্ষ গ্রন্থের আধারে বেদের সংস্কৃত এবং হিন্দি উভয় ভাষ্য প্রস্তুত করা।

13. একজন সন্ন্যাসীর রূপে স্বীয় কর্তব্যের পালন করে বিরোধীদের দ্বারা করা উপেক্ষা, অপমান, তিরস্কার, ধুৎকার, নিন্দা, কষ্ট, পীড়া, আক্রমণ, বিষপান আদিকে সহ্য করা এবং অন্তত এই মার্গে চলে নিজ জীবনকে সমর্পিত করা, মৃত্যুর বরণ করা।
14. আর্য সমাজ, পরোপকারিণী বভা, গোকৃষ্যাদিরক্ষিণী সভা, বৈদিক যন্ত্রালয় আদির স্থাপনা করে বৈদিক ধর্মকে বিশ্বভর ছাড়ানোর জন্য পুরুষার্থ করা।
15. মহান তপস্বী, ব্রহ্মচারী, যোগী, জ্ঞানী, কর্মঠ, পরোপকারী, দেশোপকারী, বাগ্মী, সমাজ সুধাকর হয়েও নিজেকে কেবল সন্ন্যাসী, উপদেশক এবং ঈশ্বর উপাসক মনে করা তথা নিজ অনুসারীদের ও প্রশংসকদেরকেও এই শিক্ষা প্রদান করা যে, আমি কেবল একজন সন্ন্যাসী, উপদেশক এবং ঈশ্বর ৫,আমার অনাবশ্যক স্তুতি বা পূজা করবে না, কেবল এক ঈশ্বর'ই উপাস্য – তাঁর এই অমূল্য শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক।
এইসব গুণসমূহ এবং কার্যের কারণে তিনি মহর্ষি নামে আখ্যায়িত।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর
সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

ঋগ্বেদ ১০।৮৬।১৩-১৪ রহস্য ~ পশুবলি নাকি বৈদিক অধ্যাত্ম ও জ্যোতিষবিজ্ঞান ?

অপপ্রচার: ঋগ্বেদ ১০।৮৬।১৪

আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়। আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দু'পার্শ্ব পূর্ণ হয়, ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

খণ্ডন:

উক্ষো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্ ।

উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥

✓ ১৩ ও ১৪ মন্ত্রের একীভূত আধিদৈবিক পক্ষে -

(বৃষাকপায়ি রেবতি) উত্তরধ্রুব রূপ ইন্দ্র, বৃষাকপির পত্নী = সূর্যপত্নী রেবতী নক্ষত্র ! (সুপুত্রে-আৎ সুস্নুষে) উত্তম পুত্রযুক্ত তথা সুপুত্রবধু (তে-উক্ষণঃ) তোমার বীর্যসেচক সূর্যের [উক্ষা=সূর্য; ঋ০ ৯।৮৩।৩, ১০।৩১।৮] (প্রিয়ং

কাচিৎকরং হবিঃ) গ্রহণযোগ্য উপহার (ইন্দ্রঃ-ঘসৎ) উত্তর ধ্রুব গ্রহণ করে = আমি উত্তর ধ্রুব খগোলরূপ পার্শ্বে ধারণ করি, তুমি চিন্তা কোরো না।

(মে হি পঞ্চদশ সাকং বিংশতিম্) আমার জন্য অর্থাৎ খগোল রূপ উদরপূর্তির জন্য ১৫ ও ২০ অর্থাৎ ৩৫ (উক্ষঃ পচন্তি) গ্রহ-উপগ্রহকে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পন্ন করি = ব্যক্ত করি। [পচ্ ধাতুর অর্থ সম্পন্ন করা, ঋ০ ১।১৬৪।৪৩ 'অপচন্ত' অর্থাৎ সামান্য সম্পাদন করা] (উত-অহম্-অদ্মি) হ্যাঁ, আমি তাদের খগোলে গ্রহণ করি। [ব্রহ্মসূত্র ১।২।৯ দ্রষ্টব্য] (পীবঃ) এজন্য আমি প্রবৃদ্ধ হয়েছি (মে-উভা কুক্ষী-ইৎ পৃণন্তি) আমার উভয় পার্শ্ব অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধদ্বয়কে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিপূর্ণ করে॥

[ভাষ্যকার: স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক]

উক্ষা শব্দ গ্রহের জন্য ঋ০ ১।১০৫।১০-এ দৃষ্ট হয় ~ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। উক্ত ৫ ও সূর্য, পৃথিবী, ইউরেনাস, নেপচুনসহ ৯ এবং পৃথিবীর ১, মঙ্গলের ২, শনি ও বৃহস্পতির ৯, ইউরেনাসের ৪ ও নেপচুনের ১ বা নেপচুন স্বয়ং এই ২৬ মোট ৩৫ গ্রহ-উপগ্রহ যা কিনা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এই মন্ত্রে সেই বিষয়ে ইংগিত দেওয়া হয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্ত ১।২৭, তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৪।১০ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১।২।৪ এবং ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত মধ্যমভাগ এটিই প্রমাণিত করে, রেবতী নক্ষত্র ও ৩৫ গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্ট্যাদিই নির্দেশ করে। বালগঙ্গাধর তিলকসহ বাকিদের বেদের নাক্ষত্রিক সময়কাল নির্ণয় সিদ্ধান্ত এভাবেই খণ্ডিত হয়।

● আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পক্ষে —

১ (মে) আমার (পঞ্চদশ উক্ষঃ) ১৫ বল সিঞ্চনকারী, ['উক্ষ সেচনে' (ভা৳) ধাতো, উণা০ ১।১৫৯; নিরু০ ১২।৯, মহন্নাম নিঘ০ ৩।৩] শরীরধারক ১০ ইন্দ্রিয় ও ৫ প্রাণসমূহকে,

কিংবা,

২. (উক্ষঃ মে) শরীরধারী আমার অর্থাৎ জীবাত্মার [উক্ষণঃ=সেচনকর্তার (সত্বান=প্রাণিন) ঋ০ ১।৬৪।২]

(পঞ্চদশ) ১০ প্রাণ-উপপ্রাণ ও ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ১৫টিকে ,এবং,

১. (বিংশতিম্) হাত-পায়ের ২০ আঙুল, বা,

২. (বিংশতিম্) দেহে প্রবেশমান জীবাত্মাকে [উনিশমুখ জীবাত্মা যিনি নিজে বিশতম - মাণ্ডুক্যোপনিষদ ৩-৪]

কিংবা এই ১৫+২০=৩৫ তত্ত্ব = ৫ যম, ৫ নিয়ম, ৬ সম্পত্তি, ৪ বৃত্তি, প্রাণায়াম - ধারণা - ধ্যান - সমাধি, ৮ সিদ্ধি , অভ্যাস, বৈরাগ্য ও মোক্ষপ্রার্থনা সমৃদ্ধ জীবাত্মাকে

বিদ্বানগণ (সাকং পচন্তি) জ্ঞান-অভ্যাস অর্থাৎ বৈরাগ্য-প্রাণায়াম দ্বারা পরিপুষ্ট করেন বা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। (উৎ) আর আমি (পীবঃ) পরিপুষ্ট হয়ে (অদ্মি) পুষ্টিদায়ক ভোগ্য দেহ এবং নানা উপভোগ্য সামগ্রী বা প্রাণসমূহকে ভোগ করি। সেই সমস্ত প্রাণ(মে) আমার (কুক্ষী) উভয় পার্শ্বকে (পৃণন্তি) পূর্ণ করে, সমস্ত প্রাণ দেহের ডান ও বামে ব্যপ্ত হয়, দেহকে পরিপুষ্ট করে । [পরিপুষ্ট হয়ে আমি সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে স্মরণ করি । বলি ~] সেই (ইন্দ্রঃ) আশ্চর্যজনক শক্তিশালী প্রভু (বিশ্বস্মাৎ উত্তরঃ) সর্বোৎকৃষ্ট । [তার এই দেহরচনা কৌশল অবিজ্ঞেয়]।

ভাবার্থ: মন্ত্রে জীবাত্মার সাথে দুইটি সংখ্যার উল্লেখ আছে । যথাক্রমে ১৫ ও ২০ । সংখ্যা দুইটির দুই রকমের তাৎপর্য ~

১. ৫টি কর্মেন্দ্রিয়, ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ৫টি প্রাণ যা দেহে বল সঞ্চার করে, এই ১৫টি তত্ত্ব এবং হাতের ১০ট ও পায়ের ১০টি মোট ২০টি আঙুল

২. ৫টি প্রাণ, ৫টি উপপ্রাণ, ৫টি কর্মেন্দ্রিয় এই ১৫টি তত্ত্ব ও ১৯টি মুখযুক্ত ২০তম তত্ত্ব জীবাত্মা ।

যারা কিনা বিদ্বান ও পণ্ডিত তারা প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মযোগী হিসেবে নিজেকে গঠন করেন, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিষ্কাম হয়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে সাধনা করেন । ফলে তারা দেহকে বেদোক্ত ধর্মকর্মের মাধ্যমে সুস্থ-সবল করে গড়ে তোলেন । তাদের দেহে প্রাণশক্তির স্ফুরণ ঘটে ও দেহ পরিপুষ্ট হয় । তখন তারা এই দেহ রচনায় জগৎনিয়ন্তা পরমেশ্বরের যে অতি আশ্চর্যজনক কৌশল ও প্রজ্ঞা তা অনুধাবন করে রোমাঞ্চিত হয় ও ভক্তিতে আপ্লুত হয় ।

□ অপপ্রচার:

ঋগ্বেদ ১০।৮৬।১৩

হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন , তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

□ খণ্ডন:

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে ।

ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥

ঋগ্বেদ ১০।৮৬।১৩

● **আধিদৈবিক অর্থ -**

(রেবতি সুপুত্রে আৎ উ সুম্নুষে বৃষাকপায়ি) হে ধনবতী [কেননা প্রাতঃসন্ধ্যায় মানব ধনোপার্জনের জন্য বের হয় ও সায়ংসন্ধ্যায় উপার্জন শেষে ফিরে আসে] ! হে সন্ধ্যার অন্ধকাররূপ পুত্রবতী ! [বৃষাকপায়ি মধ্যমস্থানীয় = সূর্য সহচরী, প্রমাণভূত নিরু০ ১২।২৭, গো০ব্রা০ ২.৬.১২; অন্ধকাররূপ সুপুত্রবতী ও তার পত্নীরূপা নিরু০ ১২.৯ উল্লেখিত মাধ্যমিকা বাক্ তথা শব্দ = তৎকালীন নিস্তব্ধতা পুত্রবধুরূপী] নিস্তব্ধতারূপ পুত্রবধূবতী সন্ধ্যাকালীন প্রভা! (তে উক্ষণঃ ইন্দ্রঃ ঘষৎ) তোমার জলীয়বাষ্পকে [নিরু০ ১২।৯] সূর্য [শত০ ব্রা০ ৪।৬।৭।১১, ৮.৫.৩.২] গ্রহণ করে। অর্থাৎ, তুমিই সান্ধ্যকালীন জলীয়বাষ্পের উৎস যা কিনা সূর্য নিজের রশ্মি দ্বারা আহরণ করে। (প্রিয়ং কাচিৎকরং হবিঃ) তুমি সেই প্রিয় ও অত্যন্ত সুখদায়ক জলীয়বাষ্পরূপ হবি প্রস্তুত করো। (ইন্দ্রঃ বিশ্বস্মাৎ উত্তরঃ) আর যে আদিত্য প্রকাশ্য ও প্রকাশক সে এই দ্বিবিধ লোক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট।

● **আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক অর্থ -**

১। হে (বৃষাকপায়ি) মেঘতুল্য সুখবর্ষিণী পরমেশ্বরের সৃজনশক্তির নিদর্শন প্রকৃতি মাতা ! হে (রেবতি) বহু ঐশ্বর্যের স্বামিনী ! (আৎ উ) এবং বর্তমানে, হে (সু-পুত্রে) উত্তম জীবরূপ সন্তানবতী! (সু-ম্নুষে) হে সুখদায়িনী! (ইন্দ্র) পরমৈশ্বর্যবান প্রভু (উক্ষণঃ) সিক্তকারী মেঘ থেকে উৎপন্ন ['উক্ষ সেচনে' ধাতু০ ৬৫৭, 'উক্ষন্ + কনিন্ প্রত্যয়' উণা০ ১।১৫৯] অথবা (উক্ষণঃ) জগত ধারণকারী সূর্যাদি লোক-লোকান্তরের [উক্ষা=সূর্য~ঋ০ ৩।৭।৬] (প্রিয়ম্) প্রীতিকারক (কাচিৎ-করম্) অনন্ত সুখদাত্রী (তে-হবিঃ) তোমার উত্তম অন্ন-সদৃশ এই জগতকে প্রলয়কালে ভক্ষণ করেন তথা এই জগতকে প্রলয়কালে গ্রাস করেন। সেই ঐশ্বর্যবান প্রভু (বিশ্বস্মাৎ উত্তরঃ) দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মার থেকেও অধিক উৎকৃষ্ট এবং শক্তিশালী।

ভাবার্থ: বৃষাকপায়ি = পরমেশ্বরের সৃজনশক্তির নিদর্শনস্বরূপা প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে ও প্রকৃতিতেই পরামাত্মা সৃজন করেন । প্রকৃতি জীবাত্মার মাতৃস্বরূপ কেননা জীবাত্মা প্রকৃতি থেকেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে জীবনধারণের উপাদান গ্রহণ করে। তাই জীবাত্মা যেন এই প্রকৃতি মাতায় আসক্ত না হয়। এই প্রকৃতি নানা ধনসম্পদযুক্ত ও আমরা সেই সম্পদ ব্যবহার করি। এখানে উপমা দেওয়া হয়েছে যেভাবে বৃষ্টির জলে উত্তম অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাকে আমরা গ্রাস করি পরমেশ্বর সূর্যাদি লোক-লোকান্তরসহ এই জগতকে প্রলয়কালে স্বীয় অভ্যন্তরে গ্রাস করেন অর্থাৎ এই ব্যক্ত জগৎ ব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিরূপে প্রলয়াবস্থায় পরমেশ্বরে বিদ্যমান থাকে ।

২। (রেবতি) হে বিভূতিযুক্তা ! (সুপুত্রে) হে সাধু জীবাত্মারূপ সন্তানযুক্তা ! ['সাধুং পুত্রং হিরণ্যয়ম্' অথর্ব০ ২০।১২৯।৫] (আৎ উ) তারপর, (সুম্নুষে) হে বিবেকখ্যাতিযুক্তা! [শ্রদ্ধামাতার সন্তান জীবাত্মা, জীবাত্মার উত্তম সহচারিণী পত্নী তথা শ্রদ্ধামাতার পুত্রবধূ হলো বিবেকখ্যাতি, পৌত্র হলো মোক্ষ] (বৃষাকপায়ি) শরীরধারী জীবাত্মার শ্রদ্ধামাতা ! ['শ্রদ্ধা জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি' যো০ দ০ ১।২০ ব্যাসভাষ্য] (তে) তোমার (ইন্দ্রঃ) গন্তব্য -

প্রাপ্তব্য পরমেশ্বর [এই] (উক্ষণঃ) ভক্তিরসসিক্ত চিত্তকে (ঘসৎ) গ্রহণ করেন, যা কিনা পরমেশ্বরের (প্রিয়ং হবিঃ) প্রিয় হবি, এবং যে হবি (কাচিৎকরম্ = ক~সুখ + চয়ন + করম্) জীবাত্মার সুখের চয়ন করে। কেননা, (বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ) পরমেশ্বর সর্বোৎকৃষ্ট।

৩। (বৃষাকপায়ি) হে বলবান, প্রযত্নকারী জীবাত্মার সহচারিণী বিভূতি! [বৃষাকপ্যগ্নি০ অষ্টা০ ৪।১।৩৭। বৃষাকপি-ঙীপ্, ঐকারাদেশশ্চ। বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্ন্যপৈবাভিসৃষ্টকালতমা নিরু০ ১২।৮। বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্নী, বৃষাকপিরাদিত্যঃ, তস্য পত্নী, তদ্বিভূতিঃ ইতি দুর্গাচার্যঃ। বৃষাকপায়ী শ্রীগৌর্যৌ-ইত্যমরঃ, ২৩।১৬। লক্ষ্মীঃ, গৌরী, স্বাহা, শচী, জীবন্তী, শতাবরী-ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ] (রেবতি) হে ধনযুক্তা! (সুপুত্রে) হে সন্তানদাত্রী! (সুস্নুষে) হে সুখবর্ষিণী! [স্নুব্রশ্চি০। উণা০ ৩।৬৬। ষ্ণু প্রস্রবণে-সঃ কিৎ, টাপ্। 'স্নুষা সাধুসাদিনীতি বা সাধুসাধিনীতি বা স্বপত্যং তৎ সনোতীতি বা' নিরু০ ১২।৯] (আৎ উ) নিরন্তর (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্যযুক্ত মানব (তোমার) (উক্ষণঃ) বর্ধনশীল পদার্থসমূহকে ['উক্ষতের্বৃদ্ধিকর্মণঃ' নিরু০ ১২।৯, 'উক্ষতের্বৃদ্ধিকর্মণঃ' নিরু০ ১২।৯] (ঘসৎ) আহার করবে, ভোগ করবে। সেই (প্রিয়ম্) প্রিয় (কাচিৎকরম্) সুখদায়ক একত্রীকৃত [ক+আ+চিঞ্ চয়নে-ক্বিপ্, তুক্+করোতেঃ-অচ্। 'সুখাচয়করং সুখকরম্' নিরু০ ১২।৯। কং সুখং তস্যাচিৎ সঙ্ঘঃ] (হবিঃ) হবি [অথর্ববেদ ২০।১২৬।১২-তে বর্ণিত ঘৃত-জল প্রভৃতি পদার্থ] বিদ্যমাম রয়েছে, [কেননা পূর্বোক্ত 'ইন্দ্রঃ']~ (বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ) ঐশ্বর্যযুক্ত মানব অন্য সব প্রাণীমাত্র থেকে উত্তম।

ভাবার্থ: মানব আত্মশক্তিকে নিজের আধ্যাত্মিক যোগবিভূতির সাথে সংযুক্ত করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করবে। ধন-সম্পদ মানবকল্যাণময় ধর্মীয় কাজে যথোপযুক্ত ব্যবহার করে তার আনন্দ নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করবে। সাধারণ মানুষ জাগতিক বিষয়ে আসক্ত হয় ও অধর্মাচরণ করে, কিন্তু যিনি ধার্মিক তিনি যোগী হয়ে পুণ্যকর্মে সম্পদ ব্যয় করে অন্য সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ হন।

✍ বাংলাদেশ অগ্নিবীর

পাণ্ডবদের জন্মের রহস্য

পাণ্ডবদের জন্ম বিষয়ে মহাভারতে লেখা হয়েছে, পাণ্ডু মৃগয়ায় সঙ্গমরত মৃগ-মৃগীরূপী কিন্দম ঋষি বধের কারণে অভিশাপ লাভ করেন যে সে যদি স্ত্রীসংসর্গ করে তবে তার মৃত্যু হবে [আদি০ অ০ ১১৮]। উক্ত বক্তব্য অনৈসর্গিক ও বেদবিরুদ্ধ বলে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা -

১। রতিকালের জন্য মৃগ-মৃগীরূপ ধারণের কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২। জীবাত্মা পাপের জন্য তির্যকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে মানবদেহ বিদ্যমান থাকতে তীর্যকযোনিতে রমণের জন্য ধারণ করার প্রসঙ্গ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক।

সিদ্ধান্ত: পাণ্ডু মূলত তার পাণ্ডুরোগ ও দুর্বল হৃদয়ের কারণে সন্তান জন্মদান কর্মে বিপদাপন্ন ছিলো।

এরপরে পাণ্ডুর রাজ্যত্যাগ করে বনে গমন (অ০ ১১৯), ব্রহ্মলোক দর্শন ও ব্রহ্মলোক দর্শনে অপুত্রক পাণ্ডুর দুঃখের বর্ণনা (অ০ ১২০) রয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে পাণ্ডু নিয়োগবিধি অনুযায়ী কুন্তীকে সন্তান উৎপাদনের জন্য প্রোৎসাহত করেন -

(১) মনুঃ স্বায়ংভুবোঽব্রবীৎ = যে বিধি স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন; নিয়োগের বিধি মহর্ষি মনু মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন

(২) উত্তমাদ্দেবরাৎপুংসঃ কাঙ্ক্ষন্তে পুত্রমাপদি = অর্থাৎ আপদ্‌কালে মানুষ নিজ থেকে উচ্চ ব্যক্তিদের থেকে পুত্রোৎপত্তির আশা করে। ঠিক কারণেই পাণ্ডবদের বারংবার 'দেব'পুত্র বলা হয়েছে। কেননা দেব অবশ্যই বিদ্বান, পণ্ডিত, মহামানবদেরই বলা হয়।

(৩) তস্মাৎ প্রহেষ্যাম্যদ্‌য ত্বাং হীনঃ প্রজননাৎস্বয়ম্ = পাণ্ডু নিজেকে সন্তান উৎপাদনের শক্তিহীন বলেছে। কোন শাপ নয়। অতঃ পূর্বাপর কথিত অভিশাপবাচক সর্ববাক্য পরবর্তীকালের যোজনা প্রমাণিত।

(৪) মন্নিয়োগাদ্যত ক্ষিপ্রমপত্যোৎপাদনং প্রতি = এই বাক্যে পাণ্ডু সুস্পষ্ট নিয়োগের আজ্ঞা প্রদান করছেন।

এতে কথিত শারদণ্ডায়নীর উদাহরণ বাস্তবিক হলেও পরবর্তী ১২১ অধ্যায়ে কুন্তী ব্যুষিতাশ্বের মৃত শরীরের সাথে যৌনসংসর্গে ৭ সন্তানের জন্মের কাহিনী শোনান যা যথার্থই অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক।

এই কাহিনীর সূত্র ধরে পাণ্ডুর ১২২ অধ্যায়ে প্রদত্ত ব্যাখ্যাও ভুল কেননা, উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুর সময়ে বিবাহবিধান ও একপতিব্রত ছিলো না এটি সর্বৈব মিথ্যা কথা। কেননা বেদে বারংবার একপতিব্রতের নির্দেশ রয়েছে। তবে মধ্যাংশ থেকে বর্ণনা পুনরায় নিয়োগপরক হিসেবে স্বাভাবিক হয় এবং পাণ্ডু আবারও নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করে -

মন্নিয়োগাৎসুকেশান্তে দ্বিজাতেস্তপসাঽধিকাৎ।

পুত্রান্ গুণসমাযুক্তানুৎপাদয়িতুমর্হসি।

এরপর কুন্তীর দুর্বাসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মন্ত্রের কথা শোনান, মন্ত্রের মাধ্যমে সন্তান প্রাপ্তি অনৈসর্গিক ও বেদবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কুন্তী উক্ত উক্ত দেবনামধারীদের সাথে নিয়োগধর্ম পালনপূর্বকই ৩ পাণ্ডবের জন্ম প্রদান করেছেন, মাদ্রীর বেলাতেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। কেননা পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র তারাও বেদব্যাসের নিয়োগজাত সন্তানই। যদি তাদের সময় অলৌকিকতার কোন আবশ্যকতা না থাকে তবে এখানেই বা কেন ? অধিকন্তু, ধর্মকে আহ্বানের পর সংস্করণভেদে বেশ কিছু বিভেদ দৃশ্যমান হয় -

১. দাক্ষিণাত্য সংস্করণ অনুযায়ী কালীপ্রসন্ন সিংহ ধর্মের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরের জন্মের উল্লেখ করেছেন।

২. কুম্ভকোণম্ সংস্করণ ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বনের মধ্যে দুজনের শারীরিক সমাগমের উল্লেখ স্পষ্টভাবে করেছেন ও নিম্নলিখিত শ্লোক তাতে বিদ্যমান -

তস্মিন্বহুমৃগেঽরণ্যে শতশৃঙ্গে নগোত্তমে।

পাণ্ডোরর্থে মহাভাগা কুন্তী ধর্মমুপাগমৎ॥

ঋতুকালে শুচিঃ স্নাতা শুক্লবস্ত্রা যশস্বিনী।

শয্যাং জগ্রাহ সুশ্রোণী সহ ধর্মেণ সুব্রতা॥

৩. গীতাপ্রেস ও CE এই শ্লোক রাখেনি। তবে গীতাপ্রেস ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধর্মসমাগমে তৎক্ষণাৎ পুত্রজন্মের কথা লিখেও সুস্পষ্টভাবে তিথি-নক্ষত্র উল্লেখ করেছেন যুধিষ্ঠিরের জন্মের।

সিদ্ধান্ত: মূল শ্লোকে স্পষ্ট 'সংযুক্তা' শব্দের উল্লেখ শারীরিক সম্পর্কই নির্দেশ করে। কেননা যদি শুধুমাত্র আহ্বান ও আশীর্বাদ করলেই সন্তান হতো তবে এই পদ নিরর্থক, পাশাপাশি একই বাক্যে 'যোগমূর্তিধরেণ' অর্থ যদি অলৌকিক ধরার কোন মানেই হয় না, বরং এর অর্থ হলো যোগিরূপী ধর্ম। পরবর্তী শ্লোকে 'সুষাব প্রবরং সুতম্' দ্বারা কুন্তীর সন্তান প্রসবেরই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তানটি দৈহিকই। অলৌকিক নয়।

এভাবেই ভীমের জন্মও হয়, অর্জুনের জন্মের সময় কুন্তীকে মাঙ্গলিক ব্রত করতে বলা হয়। তারপর পাণ্ডুও তপস্যা করা শুরু করেন এবং ইন্দ্র এসে বরদানস্বরূপ পুত্রদান করবেন জানান। মন্ত্রের মাধ্যমে পুত্র প্রাপ্তির প্রক্ষিপ্ততা ও যোজনা এখানেই রহস্য খুলে যায়। কেননা যদি মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির ও ভীমের জন্মের উল্লেখ যেভাবে প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় তবে অর্জুনের বেলায় সেটি কেন করা হলো না ? তপস্যার কী দরকার ? হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এখানে যদিও 'সূর্যেন সহ' স্থলে 'ভার্যয়া সহ' লিখে ভুলে কুন্তীকেও পাণ্ডুর সাথে তপস্যায় যুক্ত করেছেন (অ০ ১২৩)।

যাই হোক, আবার কুন্তীকে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়ে আনলে অর্জুনের জন্ম হয়।

আর রইলো, নকুল ও সহদেব। মাদ্রী কুন্তীর ৩ সন্তান ও দুর্যোধনাদি ভাইদের জন্মের পরেও নিঃসন্তান থাকায় সেই দুঃখ পাণ্ডুকে জানায়। পাণ্ডু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কুন্তীকে বলে মাদ্রীকে সাহায্য করতে। কুন্তী মাদ্রীকে বলে কোন দেবতার স্মরণ করতে, তাহলেই পুত্র হবে।

এবমুক্তাঽব্রবীন্মাদ্রীং সকৃচ্চিন্তয় দৈবতম্।

তস্মাত্তে ভবিতাঽপত্যমনুরূপমসংশয়ম্॥

মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে ও নকুল-সহদেবকে জন্ম দেয় (অ০ ১২৪)।

ততো মাদ্রী বিচার্যৈকা জগাম মনসাঽশ্বিনৌ।

তাবাগম্য সুতৌ তস্যাং জনয়ামাসতুর্যমৌ।

নকুলং সহদেবং চ রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি॥

লক্ষ্যণীয়, এই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গে কুন্তীর পূর্বে কথিত মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই অংশ এখানেও অনুপস্থিত থাকায় প্রমাণিত, মন্ত্রের মাধ্যমে সন্তানের কোন জন্মই হয়নি। কুন্তী প্রকৃতপক্ষে মাদ্রীকে পরবর্তী দুটি সন্তান জন্ম দিতে সাহস দিয়েছিলেন।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, দেবগণকে মানবভিন্ন প্রমাণ করার জন্য বারংবার দৈববাণী ও নামকরণের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ যখনই যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীমের জন্ম হয়েছে তখনই দৈববাণী হয়ে নামধাম, কর্ম, ভবিষ্যৎ নানা অলৌকিকতার বর্ণনা রয়েছে। এটিও যে প্রক্ষিপ্ত তার প্রমাণ নকুল-সহদেবের জন্মের পরেই পাওয়া যায়। যদিও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ স্বভাবসুলভ অযৌক্তিক যোজনা দ্বারা স্নেহ ও নামকরণ সংস্কার দেখা চেয়েছেন কিন্তু ঋষিরা আশীর্বাদপূর্বক যে নাম রেখেছেন এবং 'ভক্ত্যা চ কর্মণা' বালকদের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই শ্লোকে জ্বাজ্জল্যমান। শতশৃঙ্গবাসী তপস্বীদের দ্বারা বালকদের 'কর্ম ও ভক্তি' দেখে নামকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়-

নামানি চক্রিরে তেষাং শতশৃঙ্গনিবাসিনঃ।

ভক্ত্যা চ কর্মণা চৈব তথাঽঽশীর্ভির্বিশাংপতে॥

যদি পূর্বেই নাম অনৈসর্গিকভাবে নির্ধারিতই থাকতো তাহলে আবার নামকরণের জন্য 'ভক্ত্যা চ কর্মণা চৈব' বলা হতো না। তাঁদের প্রত্যেকের নামকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

জ্যেষ্ঠং যুধিষ্ঠিরেত্যেবং ভীমসেনেতি মধ্যমম্।

অর্জুনেতি তৃতীয়ং চ কুন্তীপুত্রানকল্পয়ন্॥

পূর্বজং নকুলেত্যেবং সহদেবেতি চাপরম্।

মাদ্রীপুত্রাবকথয়ংস্তে বিপ্রাঃ প্রীতমানসাঃ॥

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ধৃতরাষ্ট্র - দ্রৌপদীর প্রকৃত জন্মকথা

গত পরশু গ্রুপে একটি পোস্ট হয়, যাতে জানতে চাওয়া হয়, দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয়। অনেকেই এই ব্যাপারে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন, আমি কেবল এই প্রবন্ধে আমার চোখে পড়া কিছু চমকপ্রদ তথ্যের উল্লেখ করব এবং এ থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তাও বলব।
প্রথমেই একটিমাত্র কথায় আমার মূল বক্তব্যটিকে পেশ করি।

আমার মতে এঁরা দু'জন যাজের ঔরসে কোনো এক বনচারী অন্ত্যজ জাতির (নিষাদও হতে পারেন) নারীর গর্ভে জাত পুত্র-কন্যা। দ্রুপদ এঁদের দত্তক নেন (অথবা ক্রয় করেন)।

এরপর মহাভারত অনুসারে প্রমাণ দিতে থাকব, এ হেন আজব চিন্তাকে বাস্তব মনে করার কারণ। পাঠকগণ অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য্য ধরে বসুন।

এই প্রবন্ধে প্রথমেই প্রবন্ধের সাধারণ নিয়মানুযায়ী আমার বক্তব্যকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তারপর যুক্তিজাল সাজিয়ে সেটাকে প্রমাণ করার বদলে বরং একটা কাজ করা যাক। কয়েকটা সম্ভাবনার কথা ভেবে নেওয়া যাক, দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে। অবশ্যই আগুন থেকে জন্ম, এহেন কাল্পনিক ব্যাখ্যাকে সরিয়ে রেখে। তারপর আমরা একটা একটা করে সম্ভাবনা বাতিল করতে করতে বরং মূল উত্তরে পৌঁছব।
দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয়ের সম্ভাবনা:

১) দ্রুপদের ঔরসে তাঁর পত্নীর গর্ভে জন্ম। দ্রুপদের স্বয়ংজাত সন্তান।
২) দ্রুপদের ঔরসে ভিন্ন কোনো রমণীর গর্ভে জন্ম। দ্রুপদের স্বৈরিণীজ সন্তান।
৩) যাজ/উপযাজের ঔরসে দ্রুপদের রানীর গর্ভে জন্ম। দ্রুপদের প্রণীত/পরিক্রীত সন্তান।
৪) যাজ/উপযাজের ঔরসে ভিন্ন কোনো রমণীর গর্ভে জন্ম। দ্রুপদের দত্ত সন্তান।
৫) সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল। দ্রুপদের দত্ত/ক্রীত সন্তান।

প্রথমেই বলি, আমাদের অনেকেরই এই ধারণা আছে, দ্রোণবধের জন্য পুত্র চেয়ে যজ্ঞ করেছিলেন দ্রুপদ। তবে পুত্রের সঙ্গে একটি কন্যারও দরকার হল কেন? যে কন্যা কিনা পুত্রকেও চেয়েও ছাপিয়ে গেলেন দ্রুপদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথের অস্ত্র হিসেবে?

দুঃখিত চিত্তে জানাই, এই ধারণা সর্বৈব ভুল। মহাভারতের কবি কোথাও বলেননি, দ্রোণবধের জন্য দ্রুপদ পুত্র চাইছিলেন। আমাদের মনে এই ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছেন মহাভারতের সুবিখ্যাত অনুবাদক ও টীকাকার হরিদাস

সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়। প্রমাণ? আদিপর্বের ১৬০ তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক- "নাস্তি শ্রেষ্ঠমপত্যং মে ইতি নিত্যমচিন্তয়ৎ"। মাননীয় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় যার অর্থ করেছেন, 'আমার উৎকৃষ্ট পুত্র নাই'- এমন চিন্তা দ্রুপদ সর্বদাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনারাই বলুন, অপত্য শব্দের অর্থ কিভাবে কেবল পুত্রই হতে পারে? অপত্য শব্দের আভিধানিক অর্থই তো পুত্রকন্যা বা সন্তান-সন্ততি।
হ্যাঁ, পরে যদিও উপযাজের কাছে তিনি দ্রোণবধের জন্য একটি সুযোগ্য পুত্রই চেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও পুত্র হোক কন্যা হোক যে কোনো একটি উপযুক্ত সন্তানের কামনাতেই তিনি যে বিভোর ছিলেন- তার প্রমাণ পাওয়া যায় আদিপর্বের ১৬০ তম অধ্যায়েরই তৃতীয় শ্লোকে, যেখানে বলা হচ্ছে, তিনি পূর্বে জাত তাঁর পুত্র-কন্যাদের এবং বন্ধুবর্গকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন- জাতান্ পুত্রান্ স নির্ব্বেদাদ্ধিগ্বন্ধুনিতি চাব্রবীৎ। অবশ্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এখানেও পুত্রান্ শব্দের অর্থ পুত্র-কন্যার পরিবর্তে কেবল পুত্র করেছেন। পরপর দুটি বাক্যে যখন বলা হচ্ছে, তিনি উপযুক্ত সন্তান নেই বলে পরিতাপ করছেন এবং তাঁর অভীষ্ঠ সিদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পূর্বজাত সন্তানদের গালমন্দ করছেন- তখন কি এ কথাই মনে হয় না, দ্রুপদের কামনা ছিল একটি সন্তানের, একটি অস্ত্রের, যে তাঁকে বিজয়ের স্বাদ এনে দিতে পারবে।

এর পরের শ্লোকেই বলা হচ্ছে, দ্রুপদ দ্রোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা এবং চরিত্র চিন্তা করিয়া ক্ষত্রিয়শক্তি দ্বারা তাঁহার পরাভবের সম্ভাবনা করিতে পারিলেন না- প্রভাবং বিনয়ং শিক্ষাং দ্রোণস্য চরিতানি চ/ ক্ষাত্রেণ চ বলেনাস্য চিন্তয়ন্নাধগচ্ছত। সুতরাং দ্রোণের ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিকার তিনি ব্রাহ্মণ্যশক্তি দিয়েই করবেন বলে স্থির করলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে গঙ্গা ও যমুনার উভয় তীরস্থ সকল তপোবনে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম এমন সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষির সন্ধান করতে শুরু করলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো, পঞ্চাল কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি পীঠস্থানবিশেষ ছিল। কর্ণপর্বে কর্ণ এবং শল্যের মধ্যেকার উত্তপ্ত বাদানুবাদের সময় মহাভারতের কবি কর্ণের মুখ দিয়ে পঞ্চালের সম্পর্কে বলিয়েছেন, পঞ্চাল দেশের মানুষেরা বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপের জন্যই বিখ্যাত- ব্রাহ্মং পাঞ্চালাঃ। ফলে সে দেশের রাজা হয়ে দ্রুপদের মনে যে ক্ষাত্রশক্তি অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্যশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকবে না এবং এই ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে তিনি ভয় ও ভক্তি দুই-ই করবেন এবং কোনো কারণে ব্রাহ্মণ্যশক্তির হাতে পরাস্ত হলে তিনি ক্ষাত্রশক্তির বলে তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা না করে ব্রাহ্মণ্যশক্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিকার করার চেষ্টা করবেন; সে কথা বলাই বাহুল্য। ©চিন্তন দত্ত

গঙ্গা-যমুনার পার্শ্ববর্তী তপোবনগুলিতে সন্ধান করতে করতে অবশেষে একদিন তাঁর প্রতীক্ষার অবসান হল। তিনি এমন একটি ব্রাহ্মণবসতি খুঁজে পেলেন, কবির ভাষায়, যেখানের কোনো ব্রাহ্মণই অস্নাতক বা অব্রতী ছিলেন না- তত্র নাস্নাতকঃ কশ্চিন্ন চাসীদব্রতীঃ দ্বিজঃ। তবে কিনা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁর 'ভারতকৌমুদী' গ্রন্থে এই শ্লোকটির টীকা করতে গিয়ে (এবং অবশ্যই বঙ্গানুবাদেও) অস্নাতক এবং অব্রতী না হওয়ার পাশাপাশি এই জনপদে বসবাসরত ব্রাহ্মণদের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জুড়ে দিয়েছেন- এঁরা নাকি কেউই অব্রহ্মচারীও ছিলেন

না, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সদাসর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন করতেন এঁরা। অথচ আমরা এইমাত্র দেখলাম, মূল শ্লোকে এই ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মচারী হওয়া নিয়ে কোনো কথাই নেই।

পাঠক! এখানে একবার আমাদের থামতে হবে। ভাগীরথীতীরে যখন দ্রুপদ তাঁর হয়ে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করছেন তখন মহাভারতের কবি একটি অদ্ভুত কথা বললেন- "প্রতিকর্ত্তুং নরশ্রেষ্ঠো যতমানোহপি ভারতঃ। অভিতঃ সোহথ কল্মাষীং গঙ্গাকূলে পরিভ্রমন্।।" অর্থাৎ ভরতবংশীয় নরপতি তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু হয়ে গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টিকারী শব্দটি হল ঐ 'কল্মাষীং'। তার অর্থ কী?

নীলকণ্ঠ তাঁর 'ভারতভাবদ্দীপঃ'র টীকায় এবং সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদীর টীকায় বলেছেন, কল্মাষী বলতে এখানে যমুনাকেই বোঝানো হয়েছে- কল্মাষীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনামভিতঃ গঙ্গাকূলে চ পরিভ্রমন্, কারণ যমুনার ঘন কৃষ্ণ জল, যার উল্লেখ বিভিন্ন কাব্যে সুবিদিত। নীলকণ্ঠ তো আরও এগিয়ে বলেছেন, রাজা কল্মাষপাদের পুরীর নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্রুপদ সন্ধান করছিলেন, তাই 'কল্মাষীং' শব্দটির প্রয়োগ- কল্মাষপাদস্য পুরীং কল্মাষীমভিতঃ সমীপে ইত্যন্যে। কিন্তু আমার প্রশ্ন, মহাভারতের মহাকবি তো বিনা কারণে প্রায় কিছুই করেন না। নামের এত অভাব পড়েছিল যে ওইস্থানে 'কল্মাষীং' শব্দটি ছাড়া আর কিছু দেওয়া যেত না? নাকি এই 'কল্মাষ' এখানে অন্য কিছুর বার্তাবহ? কালো মানুষদের বাসভূমির কাছাকাছি বলেই কি 'কল্মাষ' শব্দের প্রয়োগ? কালো নদীর সঙ্গে কালো মেয়ের কি একটা অদ্ভুত মিল পাওয়া যাচ্ছে না? এখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের কথা সচেতনভাবেই বললাম না, কারণ ধৃষ্টদ্যুম্নের চেয়ে দ্রৌপদী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র; তাঁর গাত্রবর্ণের ব্যাখ্যা দিতে মহাভারতকার যতখানি আগ্রহী হবেন, তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র ছেড়ে যাবেন ভাবীকালের পাঠকদের উদ্দেশ্যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্পর্কে ততগুলি সূত্র না ছেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক, সেই অঞ্চলে দ্রুপদ যাজ ও উপযাজ নামক দু'জন শমগুণান্বিত, ব্রহ্মতেজে ভরপুর দুই ঋষির সন্ধান পেলেন; আশ্বস্ত হলেন এঁদের কাছেই তিনি অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারবেন।
দ্রুপদ ছোট ভাই উপযাজের কার্যত পায়ে পড়ে গেলেন। অর্বুদ অর্বুদ দুধেল গাই দেওয়ার লোভ দেখিয়ে উপযাজকে বশ করার চেষ্টা করলেন তিনি। সেই ফাঁকে আরও একবার বলে নিলেন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য- দ্রোণবধের জন্য তাঁর উপযুক্ত পুত্র চাই- পুত্রঃ স্যাৎ দ্রোণমৃত্যবে। দ্রুপদের প্রথমে কী আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা আমরা দেখেছি এখন দ্রুপদ কি চাইছেন তাও দেখছি। এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, একজন উপযুক্ত সন্তান পেলেই দ্রুপদ খুশি, কিন্তু আপাতত তাঁর ফার্স্ট প্রেফারেন্স পুত্রই, কন্যা নয়। কিন্তু উপযাজ পত্রপাঠ তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

আচ্ছা, দ্রুপদ কেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপযাজের কাছে গেলেন? কেন জ্যেষ্ঠ যাজের কাছে নয়? এর উত্তরও দেওয়া আছে মহাভারতেই।

মহাভারত বলছে, ‘সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার অঙ্গীকারের প্রলোভন দেখাইয়া ব্রতচারী কনিষ্ঠ উপযাজের শরণাপন্ন হইলেন'। এই বাক্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল, ‘সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া'।

আগেই বলেছি, পাঞ্চালরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই সঙ্গে কে খাঁটি ব্রাহ্মণ আর কে নয়, সে সম্পর্কে তাঁদের বাছবিচারও ছিল যথেষ্ট। ব্রাহ্মণত্বের অন্যতম সাধনা যে শম-দমের সাধনা, সেখানে লোভের অবস্থান একেবারেই দৃষ্টিকটু। কিছুক্ষণ পরেই আমরা দেখতে পাব, কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়েও উপযাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, তিনি অত্যন্ত অর্থগৃধ্ন এবং অর্থের জন্য পারেন না এমন কোনো কাজ নেই।

ব্রাহ্মণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-দান-প্রতিগ্রহ। কিন্তু সত্যি বলতে কি, প্রথম চারটিকে ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য বলে ধরে নিলেও শেষ দুটি, অর্থাৎ যার দ্বারা তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন চলত, সেগুলিকে খুব একটা ভালো চোখে কেউই দেখতে পারতেন না। এমনকি আজকের দিনে দাঁড়িয়েও ব্রাহ্মণের দান-দক্ষিণার প্রতি আগ্রহকে আমরা একটু বাঁকা চোখেই দেখি। এই ধনাকাঙ্খার জন্যই মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দ্রোণ 'ব্রাহ্ম' পঞ্চালে যথাযোগ্য সম্মান পাননি, এমনকি ব্রাহ্মণ্যসমাজের কাছে ক্রমাগত নিন্দিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে কৌলিক বৃত্তিত্যাগের সিদ্ধান্তও তাঁকে নিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক পঞ্চালে অর্থলোভী ব্রাহ্মণদের যে খুব একটা ভালো চোখে যে দেখা হত না- এটা পরিষ্কার। সে কারণেই যোগ্য, হয়তো বা যোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও যাজের কাছে না গিয়ে দ্রুপদ গিয়েছিলেন তাঁর অনুজ উপযাজের কাছে। যাজের প্রতি তাঁর ঘৃণা আরো প্রকটিত হয়, উপযাজ কর্তৃক তিনি পুনরায় যাজের কাছে প্রেরিত হওয়ার সময় তাঁর ব্যবহার দেখে, তিনি মনে মনে নিন্দা করতে করতেই যাজের কাছে গিয়েছিলেন বা বলা ভালো যেতে বাধ্য হয়েছিলেন- জুগুপ্সোমানো নৃপতির্মনসেদং বিচিন্তয়ন্।
উপযাজ প্রথমে দ্রুপদকে প্রত্যাখ্যান করলেও দ্রুপদ হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। দীর্ঘ একবছর ধরে অক্লান্তভাবে উপযাজের সেবা করে গেলেন তিনি। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে উপযাজ দ্রুপদকে তাঁর দাদা যাজের শরণাপন্ন হতে বললেন। কারণ হিসেবে যা বললেন, তা অতি চমকপ্রদ। আমি আপনাদের সুবিধার্থে উপযাজের এই বক্তব্যের সংস্কৃত এবং বাংলা অনুবাদ পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি।

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা মমাগৃক্ষাদ্বিচরন্ গহনে বনে।
অপরিজ্ঞাতশৌচায়াং ভূমৌ নিপতিতং ফলম্॥
বঙ্গানুবাদ: একদা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিবিড় বনে বিচরণ করিতে থাকিয়া ভূমির পবিত্রতা না জানিয়েই তাহাতে নিপতিত একটি ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তদপশ্যমহং ভ্রাতুরসাম্প্রতমনুব্রজন্।
বিমর্শং সংকরাদানে নায়ং কুর্যাৎকদাচন॥
বঙ্গানুবাদ: আমি পিছনে যাইতে যাইতেই ভ্রাতার সেই অসঙ্গত কার্য দেখিয়াছিলাম; সুতরাং উনি কোনো সঙ্করদোষযুক্ত বস্তু গ্রহণ করিতে কদাপি বিবেচনা করিবেন না।

দৃষ্ট্বা ফলস্য নাপশ্যদ্দোষান্পাপানুবন্ধকান্।
বিবিনক্তি ন শৌচং যঃ সোঽন্যত্রাপি কথং ভবেৎ॥
বঙ্গানুবাদ: যিনি ফলটি দেখিয়াই তাহার পাপের কোনো পর্যালোচনা করেন নাই এবং তাহার পবিত্রতার বিষয়ক কোন বিবেচনা করেন নাই, তিনি অন্য স্থানেই বা কেন তাহা করিবেন?

সংহিতাধ্যযনং কুর্বন্বসনগুরুকুলে চ যঃ।
ভৈক্ষমুৎসৃষ্টমন্যেষাং ভুঙ্ক্তে স্ম চ যদা তদা॥
বঙ্গানুবাদ: তিনি গুরুগৃহে বাস করিবার সময় বেদ পাঠ করিতেন, অথচ যখন তখন অন্যের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেন।

কীর্তয়নগুণমন্নানামঘৃণী চ পুনঃ পুনঃ।
তং বৈ ফলার্থিনং মন্যে ভ্রাতরং তর্কচক্ষুষা॥
বঙ্গানুবাদ: উপরন্তু ঘৃণাশূন্য হইয়া বারবার সেই অন্নের প্রশংসা করিতেন। সুতরাং সেই ভ্রাতাকে আমি তর্কের দৃষ্টিতে ধনলোভী বলিয়াই মনে করি।

মহাভারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় চরিত্রকে মহাভারতকার কঠোর হৃদয়ে মহাকাব্যের রথচক্রের তলায় নিষ্পেষিত করে দিয়েছেন। সেই তিনি কেবল একটা ফল খাওয়া নিয়ে পাঁচ-পাঁচখানা শ্লোক লিখে যাবেন, এ কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া মাটিতে পড়ে থাকা নাম-না-জানা ফল খাওয়ার মতো অত্যন্ত তুচ্ছ একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই স্থির হচ্ছে কে যজ্ঞসেনের হয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার উপযুক্ত- এটাও মেনে নিতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়।

আচ্ছা, এমন যদি হয়, ভূমির পবিত্রতা না জেনে তাতে নিপতিত ফল গ্রহণ করার আড়ালে যদি অজ্ঞাতকুলশীল কোনো রমণীকে যাজের গ্রহণ করার কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে? হতেই পারে, সে রমণীর গাত্রবর্ণ ছিল কালো; 'কল্মাষী'র কাছাকাছিই বাস যখন। উপযাজ সে সময় যাজের পিছন পিছন গিয়ে যাজের এই কাজের সাক্ষী হয়েছিলেন। হয়তো দ্রুপদ দত্তক নয়, উপযাজের কাছে একটি প্রণীত পুত্রের (ক্ষেত্রজ পুত্র; বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে যদি কোনো শ্রেষ্ঠতর পুরুষের ঔরসে সন্তানের জন্ম হয় তবে সেই সন্তানকে প্রণীত সন্তান বলা হয়) জন্ম দেওয়ার আকাঙ্খা নিয়েই এসেছিলেন। উপযাজ এই কার্যে অস্বীকৃত হলে তিনি দ্রুপদকে পাঠান তাঁর বড়ভাই যাজের

কাছে, একটি পরিক্রীত পুত্রের (অন্য কোন পুরুষকে যদি ধনের লোভ দেখিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়, তবে সেই মিলনজাত সন্তান পরিক্রীত নামে পরিচিত হয়) জন্ম দেওয়ার আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে। সে জন্যই হয়তো উপযাজের বক্তব্য, "তিনি যে কাজ একবার করেছেন, সে কাজ দ্বিতীয়বার করতেই বা আপত্তি কোথায়?" বড় ভাইয়ের প্রতি উপযাজের ঘৃণা আরও স্পষ্ট হয়, যখন তিনি বলেন, "তিনি গুরুগৃহে বাস করিবার সময় বেদ পাঠ করিতেন, অথচ যখন তখন অন্যের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেন।" যদিও এখানে স্পষ্টভাবে 'ভিক্ষান্ন' বলে উল্লেখ করেই দেওয়া হয়েছে, তবুও উচ্ছিষ্ট ভিক্ষান্ন খাওয়া এবং তার প্রশংসা করার আড়ালে আমার কূট মস্তিষ্কে অন্য কোনোরকম ধারণার উদ্ভব হয়, তবে সে কথা প্রকাশ্যে না বলাই ভালো।®চিন্তন দত্ত

যাই হোক, দ্রুপদ যাজের এই অসঙ্গত কাজের জন্য তাকে মনে মনে গাল পাড়তে পাড়তেও উপায়ান্তর না দেখে তাঁর পায়েই গিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সেখানে দ্রোণের ধনুর্বেদে পারঙ্গমতা ও তার ফলে তাঁর নিজের শোচনীয় পরাজয়ের কথা বলে যাজের মন কিঞ্চিৎ আর্দ্র করে 'ব্রাহ্ম' পঞ্চালের রাজার উপযুক্ত কথাই বলে বসলেন, "মহাধনুর্ধর ও মহামনা সেই দ্রোণ নিশ্চয়ই তাঁর ব্রাহ্ম তেজেই ক্ষাত্র তেজ প্রতিহত করেন"। অর্থাৎ, দ্রুপদ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, তাঁর সহপাঠী আপন অধ্যবসায়ের গুণেই তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি এখনও মনে করে চলেছেন দ্রোণের এই তেজের পিছনে রয়েছে কেবলই তাঁর জন্মমাহাত্ম্য। এতেই শেষ নয়, দ্রুপদ আরও বললেন, "আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তিনি (দ্রোণ) ব্রাহ্ম তেজ ধারণ করেন এবং সেই ব্রাহ্মতেজকে অগ্রবর্তী করিয়া ক্ষাত্র তেজ ধারণপূর্বক যুদ্ধে বিপক্ষদিগকে ধ্বংস করেন। বিধাতা ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র এই দুইটি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্ম তেজই শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই আমি ক্ষাত্র তেজ থাকিতেও ভীত হইয়া ব্রাহ্ম তেজেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।" অবশেষে আগের বহুবারের মতোই যাজের কাছে তিনি সবিনয়ে প্রার্থনা করলেন, এই ব্রাহ্মশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষাত্রশক্তি দিয়ে লড়তে তিনি অপারগ, ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিকার করতে তাঁর প্রয়োজন অধিকতর তেজীয়ান ব্রাহ্মশক্তি, যা দ্রোণের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বেদজ্ঞ যাজই তাঁকে দিতে পারেন। যাজের ব্রাহ্মশক্তির সাহায্য পেলে তিনি যুদ্ধে দুর্জয় ও দ্রোণহন্তা পুত্রলাভ করবেন।

বারংবার ব্রাহ্ম শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্রাহ্ম শক্তির কামনা করা (এবং অবশ্যই সে শক্তির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন)- এ কথা কি ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে দ্রুপদের ক্ষাত্রতেজ তথা ক্ষাত্ররক্তের পরিবর্তে ব্রাহ্মতেজ তথা ব্রাহ্মরক্তের উপস্থিতির কথাই সুপ্রমাণ করে না? এতবার দ্রুপদ ক্ষাত্রশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে ব্রাহ্মতেজযুক্ত শক্তি চেয়েছেন, তাতে করে স্পষ্টই মনে হয় দ্রুপদ নিজের তেজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছেন এবং সেই তেজে জাত সন্তান তাঁর কখনোই কাম্য ছিল না। অন্যথায় তাঁর কাছে শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা (শেষ দু'জন দ্রুপদেরই সন্তান কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা অবশ্য মহাভারতের কোথাও দেওয়া হয়নি)- প্রমুখ মহা মহা বীরেরা তো ছিলেনই, তাঁদের গালমন্দ করে নতুন পুত্র তিনি চাইবেনই বা কেন? আর যদি এঁদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান একটি নতুন সন্তান তিনি চাইতেনই, তবে তো নিজের ঔরসেই যে কোনো নারীর গর্ভেই তিনি সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন, এত লুকোছাপা এবং ব্রাহ্মশক্তির প্রতি এত আগ্রহের তো কোনো কারণ দেখি না। আর যদি এঁরা দ্রুপদের কোনো গোপন প্রণয়ের ফসল হন, তবে দ্রুপদ পূর্বেই এদের বার করতে পারতেন, খামোকা

নিজের পরাজয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন কেন? আর এই যুক্তিও খারিজ হয়ে যায় ক্ষাত্রতেজের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ ও ব্রাহ্মতেজের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে। কাজেই দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন যাঁরই ঔরসজাত সন্তান হোন না কেন, দ্রুপদ যে এঁদের Biological father নন- এ কথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়ে গেল দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনা। ব্রাহ্মরক্তের প্রতি দ্রুপদের আগ্রহাতিশয্যের কারণে নির্দ্বিধায় বাদ দেওয়া চলে দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের অজ্ঞাতকুলশীল হওয়ার পঞ্চম সম্ভাবনাটিকেও।

তাহলে এখন প্রশ্ন হল, দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন কার ঔরসজাত সন্তান?

আচ্ছা, যাজের সঙ্গে দ্রুপদের কথোপকথনের অংশটি একবার খেয়াল করুন তো। সেই যাজ, যাঁকে দ্রুপদ নিজেই বড় একটা সুনজরে দেখেন না, তাঁর উদ্দেশ্যে "আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, আপনিই কেবল আমাকে সাহায্য করতে পারেন" এবং উপযুক্ত মূল্য পাওয়া মাত্রই যাজের এই অনুরোধ স্বীকার করা- ইত্যাদি বিষয় কি এই দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে না, যে, ধৃষ্টদ্যুম্নের ধমনীতে প্রবাহিত ব্রাহ্মরক্তের উৎস আর কেউ নন, স্বয়ং যাজ? তাছাড়া উপযাজের কাছে দ্রুপদ যখন প্রথম এই প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তা নাকচ করে দেন। বছর ঘুরলে দ্রুপদের প্রতি তাঁর খানিকটা মায়া জন্মালেও নিজের সিদ্ধান্তে তিনি অনড় ছিলেন, তাই নিজে দ্রুপদের প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন যাজের কাছে। এতকিছুর পরেও, এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বা জাতির রমণীদের প্রতি তাঁর যা মনোবৃত্তি, তাতে তিনি দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নকে জন্ম দেওয়ার জন্য কোনো অব্রাহ্মণ রমণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন- এ একেবারেই অসম্ভব।

দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কিত যে পাঁচটি সম্ভাবনার কথা আমরা বিচার করেছিলাম, তার মধ্যে ইতিমধ্যেই বাদ গেছে, তিনটি সম্ভাবনা- পড়ে আছে কেবল দুটি, চতুর্থ এবং পঞ্চম। দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন যাজ/উপযাজের ঔরসে পঞ্চালরাজ্ঞীর গর্ভে জাত সন্তান অথবা অপরাপর কোনো নারীর গর্ভে জাত। যাজকে মূল্য দেওয়ার লোভ দেখানোর ফলে এখনও পর্যন্ত দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্রুপদের পরিক্রীত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনার দিকেই, অর্থাৎ রাজ্ঞীর গর্ভে জাত হওয়ার দিকেই পাল্লা ভারী হয়ে আছে। দেখা যাক, যুক্তির স্রোত আমাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায়।© চিন্তন দত্ত

দ্রুপদের কাছ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক পয়স্বিনী গাভী দান হিসেবে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে যাজ সন্তুষ্ট হলেন। উপযাজকে নির্দেশ দিলেন রাজাকে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা বলে দিতে। নির্দিষ্ট সময়ে বিধি অনুসারে যজ্ঞও সম্পন্ন হল।

কিন্তু এরপরেই কাহিনীতে মোচড়। হঠাৎ করে যাজ, দ্রুপদের রানীকে (এখানে তাঁকে পৃষতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রবল সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, তবুও পুত্রবধূ কন্যাসমা- এই নির্দোষ কথা ভেবেই আপাতত এই বিতর্কের ওপর যবনিকা টানি।) ডেকে বললেন আপনার যমজ সন্তান উপস্থিত হয়েছে- পৃষতি! মিথুনং ত্বামুপস্থিতম্।

প্রচণ্ড খটকা লাগছে। উপস্থিত? উপস্থিত হয়েছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী? জন্মাননি? তবে কি আগেই জন্মেছেন তাঁরা, এখন কেবল কাম্পিল্যে উপস্থিত হয়েছেন? আর সর্বোপরি, কোথায় উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা? এখনও তো যজ্ঞবেদী থেকে তাঁদের উত্থান ঘটেনি!

যাকগে, তা দ্রুপদের মহিষী কী করলেন এই এত আনন্দের সংবাদ শুনে? তিনি অম্লানবদনে বললেন, "ব্রাহ্মণ! আমি এখনো মুখ প্রক্ষালন করি নাই এবং স্নান না করার অঙ্গে এখনও তেলের সুন্দর সৌরভ রহিয়াছে। অতএব যাজ! একটু অপেক্ষা করুন, পুত্র আমার প্রিয় হইলেও আমি এখনই হব্য গ্রহণ করিতে পারিব না।"-
অবলিপ্তং মুখং ব্রহ্মন্দিব্যান্গন্ধান্বিভর্মি চ।
সূতার্থে নোপলব্ধাঽস্মি তিষ্ঠ যাজ মম প্রিয়ে॥

রাজ্য রক্ষা পাবে, রাজার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার হবে, দুই পঞ্চাল আবার একত্রিত হবে- এমন এক সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে রানী কি বলছেন? না, মুখ ধোননি এবং স্নান করেননি- কাজেই হব্য গ্রহণ করতে পারবেন না। প্রজারা উৎকণ্ঠিত হয়ে নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে, রাজ্যের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে যে যজ্ঞের সঙ্গে সেই যজ্ঞে প্রধানা মহিষীর এমন গা-ছাড়া মনোভাব? সম্ভব? আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো হলেই তো সকাল থেকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়!

রানী কি প্রথমে এই দত্তক পুত্রদের সহজে স্বীকার করতে পারেননি? এই আচরণ থেকে এবং পরবর্তীতে তাঁর একটি মন্তব্য থেকে কিন্তু সে সম্ভাবনার পাল্লাই ভারী হয়।

যজ্ঞাগ্নি থেকে প্রথমে বেরিয়ে এলেন বর্ম পরিহিত, অস্ত্রধারী, অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন। বেরিয়ে এসেই তিনি রথে চড়ে একবার পাঞ্চালদের সামনে নিজের চেহারাখানি দেখিয়ে এলেন। সাধু সাধু রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। দৈববাণী হল, দ্রোণবধের জন্য জাত এই কুমার পাঞ্চালদের ভয় দূর করবে, যশ বৃদ্ধি করবে এবং রাজার শোকও অপনীত করবে। দৈববাণীর সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রজাদের আনন্দোল্লাসে মেদিনী বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হল।

তারপর বেরিয়ে এলেন যাজ্ঞসেনী। তিনি সৌভাগ্যশালিনী, সুদর্শনা এবং কৃষ্ণ আয়তচক্ষুযুক্তা। তিনি শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশাক্ষী, কুঞ্চিত ঘনকালো কেশবতী এবং তাম্রবর্ণ নখ, সুন্দর ভ্রূযুক্তা। তিনি মানুষের শরীরে সাক্ষাৎ দেবী।

তাঁর নীলপদ্মের ন্যায় অঙ্গসৌরভ একক্রোশ দূরেও অনুভূত হয়। তিনি পরম সুন্দর রুপধারিণী এবং সমগ্র বিশ্বে তুলনাহীনা। এই দেবরূপিনী কন্যা দেব, দানব ও যক্ষেরও আকাঙ্ক্ষিত:

কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা ।
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা ।।
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্ধজা ।
তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রূশ্চারুপীনপয়োধরা ।।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী ।
নীলোৎপলসমগন্ধ যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবায়তি ।।
যা বিভর্তি পরং রূপং যস্যা নাস্ত্যপমা ভুবি ।
দেবদানবযক্ষাণামীপ্সিতাং দেবরূপিণীম ।।

দ্রৌপদীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী হল, এই কুমারীর নাম হবে কৃষ্ণা এবং এ ক্ষত্রিয়দের বিনাশের কারণ হবে। এর জন্যই কুরুবংশের গুরুতর ভয়ের কারণ জন্মাবে।

পাঞ্চালদের গর্জনে এবার যেন আকাশ ভেদ করল। বেশ বুঝতে পারি, কুরুদের ধ্বংসের খবর শুনেই তাদের অমন হর্ষোল্লাস, কিন্তু তার মধ্যেও পুরো দৈববাণীটা শুনলে বোধ করি ভালো হত। শুধু কুরুবংশ নয়, সমগ্র ক্ষত্রিয়কূলেরই ধ্বংসের বার্তা বহন করে নিয়ে এলেন এই অগ্নিজাতিকা। যাক, সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।
অবশেষে যাজের উদ্দেশ্যে ভেসে এল পঞ্চালরাজ্ঞীর সেই অবাক করা বক্তব্য, "ইহারা যেন আমাকে ছাড়া অন্যকে জননী বলিয়া না জানে"- ন বৈ মদন্যাং জননীং জানীয়াতামিমাবিতি।

এখানেই শেষ নয়, আরও অবাক করা বক্তব্য রাখলেন স্বয়ং বেদব্যাস। তিনি কথক ব্রাহ্মণের (দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের আবির্ভাবের পুরো ঘটনাটাই পাণ্ডবরা শুনছিলেন এক ব্রাহ্মণের মুখে) মুখ দিয়ে বলালেন, "যাজও রাজার সন্তোষ জন্মাইবার ইচ্ছায় মহিষীকে বলিলেন, তাহাই হইবে"- তথেত্যুবাচ ত্বাং যাজো রাজঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

কয়েকটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠে আসে এই দুটি পরপর শ্লোক থেকে।

১) যদি দ্রুপদের মহিষী দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের গর্ভধারিণী জননীই হন, তবে তিনি বলবেন কেন, "ইহারা যেন আমাকে ছাড়া অন্যকে জননী বলিয়া না জানে"? তবে কি তিনি এদের গর্ভধারিণী নন? এঁদের অপর কোনো জননী রয়েছেন? তিনিই এদের গর্ভধারিণী? কে তিনি?
২) বেদব্যাস বললেন কেন, যাজ রাজাকে 'সন্তুষ্ট করার জন্য' রাজমহিষীকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন? তবে কি আমাদের পূর্ববর্তী সন্দেহই সঠিক? রাজ্ঞী দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মদাত্রী মা নন? তিনি অন্য কেউ? কেবল রাজাকে

সন্তুষ্ট করতেই যাজকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে এবং মুখ বন্ধ রাখতে হয়েছে? পরিস্থিতি তো অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

কিছুক্ষণ আগেই আমরা বলেছিলাম, দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের পরিক্রীত পুত্র হওয়াই বেশি সম্ভব। কিন্তু রাজ্ঞী এবং যাজের এই বক্তব্যের পর এই ধারণা থেকে আমাদের সরে আসতেই হচ্ছে। দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রুপদের অংশজাত নন, তেমনি দ্রুপদের মহিষীর রক্তও বইছে না তাঁদের ধমনীতে।
এর আগেই দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয়ের সম্ভাবনাগুলির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সম্ভাবনা বাদ গিয়েছে। এখন বাদ গেল চতুর্থ সম্ভাবনাটিও। অতএব এখন কেবল একটিমাত্র সম্ভাবনাতেই আমাদের সিলমোহর দিতে হবে। দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিতভাবেই যাজের ঔরসে কোনো ভিন্ন রমণীর গর্ভে জাত সন্তান। তিনি দ্রুপদের দত্ত বা ক্রীত সন্তান। ©চিন্তন দত্ত

সত্যি বলতে কি, যাজকে দ্রুপদের পয়স্বিনী গাভী দেওয়ার ঘটা দেখলে দত্তের পরিবর্তে ক্রীত সন্তান মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আবার উপযাজ, যাজের অর্থগৃধ্নুতার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে যাজ যে বিনামূল্যে তাঁর সন্তানদের রাজার হাতে ছেড়ে দেবেন, এমনটাও মোটেই মনে হয় না। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুপদের ক্রীত সন্তান বলাই উচিত, যাঁদের জন্ম যাজের ঔরসে কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় রমণীর গর্ভে।

এখন আমাদের লক্ষ্য সেই অজ্ঞাতপরিচয় রমণী, অর্থাৎ দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের মাতার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে বের করা, যদিও তা মোটেই সহজ হবে না।

আচ্ছা, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, খানিকক্ষণ আগে, উপযাজের মুখে যাজের 'ভূমির পবিত্রতা না জানিয়াই' একটি ফল গ্রহণ করার ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, এই ঘটনার রূপকে যাজের সঙ্গে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল, সম্ভবত কৃষ্ণবর্ণের কোনো রমণীর মিলনের কথা বলা হয়েছে? দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্ন এই মিলনের ফলে জাত সন্তান হওয়া কি খুবই অসম্ভব? হয়তো যাজ তাঁর এই সন্তানদের আপন পরিচয়ে পরিচিত করাননি, ব্রাহ্মণের উপযুক্ত জাতকর্ম করাননি, কিন্তু যোগাযোগ ঠিকই রেখেছিলেন। হয়তো তাঁরা মাতুলালয়েই বেড়ে উঠেছিলেন এবং সেখানেই ধৃষ্টদ্যুম্ন শস্ত্রবিদ্যার প্রাথমিক পাঠটুকু সমাপ্ত করেছিলেন। দ্রৌপদীর স্বাধীনচেতা লৌহকঠিন মনোভাবও হয়তো ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিয়মের নিগড়ের বাইরে অবস্থিত এই স্বাধীন জনজাতির থেকেই প্রাপ্ত। অথবা এসব কিছু নাও হতে পারে। যাজ হয়তো তাঁর সন্তানদের তাঁর আশ্রমেই রেখেছিলেন এবং প্রতিবেশী কোনো ধনুর্বেদজ্ঞ ঋষির কাছেই শস্ত্রবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। মনে রাখতে হবে, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারথী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর যুদ্ধবিদ্যা ভীমার্জুন বা ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের সমতুল্য ছিল না এবং সেই শিক্ষাটুকুর বেশিরভাগও তাঁর দ্রোণের কাছ থেকেই প্রাপ্ত।

এবার আমাদের নবলব্ধ সিদ্ধান্তগুলির ওপর ভিত্তি পুরো বিষয়টা শুরু থেকে একবার পুনর্গঠন করা যাক।

দ্রোণের কাছে পরাজিত হয়ে এবং অর্ধেক রাজ্য হারিয়ে দ্রুপদ তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সন্তান লাভের আশায় গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী তপোবনগুলিতে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন। পঞ্চালের তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল যে, দ্রোণ কেবল ব্রাহ্মশক্তির বলে বলীয়ান হয়েই তাঁর ক্ষাত্রশক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। কাজেই দ্রোণের ব্রাহ্মশক্তিকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে তিনি দ্রোণের চেয়েও শক্তিশালী ব্রাহ্মশক্তির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশেষে যমুনাতীরস্থ অনার্য অধিবাসীদের বাসস্থানের নিকটবর্তী এক তপোবনে যাজ ও উপযাজ নামক দুই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সন্ধান পেয়ে তিনি তাঁদের অনুরোধ করেন তাঁর মহিষীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে, বিনিময়ে বহু ধনের লোভও দেখান তিনি। প্রথমে তিনি কনিষ্ঠ উপযাজের কাছেই গিয়েছিলেন, তিনি দ্রুপদকে পাঠান তাঁর দাদা যাজের কাছে। যাজের কাছে তিনি পুনরায় এই আবেদন জানালে যাজ সম্ভবত তাঁকে তাঁর যমজ পুত্র-কন্যার সম্পর্কে অবহিত করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে চোখ রেখে একজন সদ্যোজাত শিশু অপেক্ষা দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান লাভ দ্রুপদের কাছেও লাভজনক বলে মনে হয়। তিনি যাজকে বহু অর্থ ও গোসম্পদ দিয়ে এই মিথুনকে ক্রয় করেন ও যাজ-উপযাজকে দিয়ে একটি কৃত্রিম যজ্ঞের আয়োজন করিয়ে পঞ্চালবাসী ও জম্বুদ্বীপের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিলেন, দেবতার আশীর্বাদে পঞ্চালের দুই পরম শত্রু- দ্রোণ ও কুরুরাজ্যকে ধ্বংস করার বিধিলিপি কপালে নিয়ে দ্রুপদের যমজ সন্তান যজ্ঞবেদী থেকে উত্থিত হয়েছে। কুরুরাষ্ট্রের এতে কি প্রতিক্রিয়া হল, বোঝা গেল না, কিন্তু দ্রোণ ভীত হয়ে বিধির বিধানকে কার্যত সফল করার উদ্দেশ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে উদ্যোগী হলেন।

এখন আমাদের সামনে অবধারিতভাবে উত্থিত হবে দুটি প্রশ্ন:

১) ক্রীত পুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিকার না পেলেও দ্রুপদ কেন প্রণীত বা পরিক্রীত পুত্রের বদলে ক্রীত পুত্রের প্রতি আগ্রহী হলেন?
২) ক্রীত পুত্র তো মহাভারতীয় সমাজে বৈধ ছিল। তা সত্ত্বেও যাজ-উপযাজকে দিয়ে শুধু শুধু একটা যজ্ঞ করানোর কি প্রয়োজন ছিল?

এক এক করে এই প্রশ্নদুটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।

১) পাণ্ডু তাঁর বনবাসের সময় কুন্তীকে বলেছিলেন, শাস্ত্রানুমোদিত বারো রকম পুত্রের কথা, যাদের মধ্যে ছয় রকম পুত্র বন্ধুদায়াদ অর্থাৎ পিতৃসম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত এবং ছয় রকম পুত্র অবন্ধুদায়াদ অর্থাৎ পিতৃসম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। © চিন্তন দত্ত
ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদের মধ্যে পড়ে:
ক) স্বয়ংজাত (বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে স্বামী নিজের ঔরসে যে পুত্রের জন্ম দেন),
খ) প্রণীত (শ্রেষ্ঠতর বর্ণের কোন পুরুষকে নিয়োগ করলে তাঁর ঔরসে আপন পত্নীর গর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয়)
গ) পরিক্রীত (ধনরত্নের বিনিময়ে অপর কোনো পুরুষের ঔরসে আপন পত্নীর গর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয়)

ঘ) পৌনর্ভব (কোনো বিবাহিতা স্ত্রীকে যদি অন্য কোনো পুরুষ পুনরায় বিবাহ করে, তবে সেই বিবাহের ফলে সেই স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানকে পরবর্তী স্বামীর পৌনর্ভব সন্তান বলা হয়)

ঙ) কানীন (কুমারী অবস্থায় কন্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়)

চ) স্বৈরিণীজ (বিবাহিত কোনো কন্যা স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের ঔরসে যে সন্তানের জন্ম দেয়, তাকে ওই কন্যার স্বামীর স্বৈরিণীজ সন্তান বলা হয়)

ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদের মধ্যে পড়ে

ক) দত্ত (পিতা-মাতা যদি তাদের সন্তানকে অন্য কোনো দম্পতির কাছে দান করেন, তবে সে দত্ত)

খ) ক্রীত (অন্যের সন্তানকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করলে সে ক্রীত)

গ) কৃত্রিম বা স্বয়মুপাগত (কোনো শিশু আপনিই কোনো দম্পতির কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে কৃত্রিম বা স্বয়মুপাগত সন্তান বলা হয়)

ঘ) সহোঢ় (বিবাহের সময় যদি কন্যা গর্ভবতী থাকে, তবে সেই সন্তানকে সহোঢ় বলা হয়)

ঙ) জ্ঞাতিরেতা (সহোদর ছাড়া অন্য কোনো আত্মীয় পুত্র)

চ) হীনযোনিধৃত (হীনজাতীয়া কন্যার গর্ভে জাত সন্তান)

পাণ্ডুর বক্তব্য অনুসারে এই বারো প্রকার পুত্র প্রত্যেকে তাদের পূর্ববর্তী তুলনায় হীনতর। উপরোক্ত বারো প্রকার সন্তানের পরিচয় দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন, ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদের মধ্যে কোনো প্রকারই গ্রহণ করা দ্রুপদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেবল প্রণীত বা পরিক্রীত বাদে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে দ্রুপদ হয়তো যাজ বা উপযাজের কাছে প্রণীত বা পরিক্রীত পুত্রেরই কামনা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় যাজ বা উপযাজের ঔরসে দ্রুপদের প্রণীত বা পরিক্রীত পুত্র জন্মালে তাদের বয়স হত অনেক কম, যা দ্রুপদকে দ্রোণবধ বা কুরুরাজ্য ধ্বংস- কোনোক্ষেত্রেই তেমন সাহায্য করতে পারত না, ফলতঃ দ্রুপদের আজন্মলালিত বাসনা- আর্যাবর্তের রাজনীতিকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসা কেবল স্বপ্ন হয়েই থেকে যেত। কাজেই ইচ্ছা না থাকলেও অবন্ধুদায়াদ পুত্র গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন। অপরদিকে অবন্ধুদায়াদ পুত্রদের মধ্যেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে তিনি অপারগ হলেন, কারণ আগেই বলেছি, যাজের মতো অর্থলোভী ব্যক্তি কখনোই বিনামূল্যে তাঁর সন্তানদের দ্রুপদের হাতে তুলে দিতেন না।

২) এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের দ্রুপদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে খানিকটা জানতে হবে।

দ্রুপদের পিতামহ ছিলেন সোমক। তাঁর একশত দার পরিগ্রহ করলেও পুত্র হয়েছিল মাত্র একটি, তার নাম জন্তু। কিন্তু একশত মায়ের একমাত্র পুত্র হওয়ায় জন্তু বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত আদরের প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ক্রমাগত তার প্রতি আদরের আতিশয্য বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে সোমক তাঁর ঋত্বিকের পরামর্শে একটি যজ্ঞ করেন, যে যজ্ঞ করলে সোমকের একশত পুত্রসন্তান জন্ম নিশ্চিত। কিন্তু এই

যজ্ঞের কঠিন বিষয় ছিল, যজ্ঞটি করতে হত জন্তুর বসা (চর্বি) দিয়ে। মহাভারত অনুসারে এই যজ্ঞের ধোঁয়া গ্রহণ করতেই সোমকের একশত রানী গর্ভবতী হন এবং জন্তুও তাঁর পুত্ররূপে পুনর্জীবন লাভ করেন। সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তুই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং দ্রুপদপিতা পৃষত সর্বকনিষ্ঠ।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পঞ্চালে পুত্রলাভের জন্য নানাপ্রকার যজ্ঞ করা নতুন তো কিছু ছিলই না, বরং নিঃসন্তান দশার হাত থেকে মুক্তি পেতে সেটিই একমাত্র পথ বলে মনে করা হত। পঞ্চালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাড়বাড়ন্তই হয়তো এর কারণ। দ্রুপদ পঞ্চালের এই সংস্কৃতিরই সুযোগ নিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের পন্থা অবলম্বন করে একটি লোকদেখানো যজ্ঞ করে প্রচার করে দিয়েছিলেন, তাঁর সন্তানদের জন্ম বিশেষভাবে- সরাসরি যজ্ঞাগ্নি থেকে উঠে এসেছেন তাঁরা। যাতে করে তাঁরা রণক্ষেত্রে বা শত্রুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁদের দৈবপ্রেরিত মনে করে শত্রুর অর্ধেক ক্ষমতাই হ্রাস পেয়ে যায়। এটি পঞ্চালের দীর্ঘদিনের প্রথা বলে হঠাৎ দু'জন পূর্ণবয়স্ক কুমার-কুমারীর আবির্ভাব কিভাবে ঘটল তা নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সন্দেহ করারও কোনো অবকাশ থাকত না। দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকৃত পরিচয় গোপন করার জন্যই পূর্বপুরুষদের শুরু করে যাওয়া এই প্রাচীন প্রথাটির আশ্রয় নেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল দ্রুপদের পক্ষে।

©চিন্তন দত্ত

[শ্রীযুক্ত চিন্তন দত্তের পোস্ট থেকে কোন বিকৃতি ব্যতীত সরাসরি উদ্ধৃত ও সর্বকৃতজ্ঞতা]

#অগ্নিজাতকের_পরিচয়

#কলমে_চিন্তন_দত্ত

মহর্ষি দয়ানন্দের 'সংস্কৃত-বাক্য-প্রবোধ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত বিশটি সিদ্ধান্তরত্নাবলী

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত বলার অভ্যাসের সহায়তার উদ্দেশ্য মহর্ষি দয়ানন্দ জী আজ থেকে প্রায় ১৩৮ বর্ষ পূর্বে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'সংস্কৃত-বাক্য-প্রবোধ' নামক এক ছোট গ্রন্থ লিখেন। এখানে বিভিন্ন বিষয় সমন্ধে অনেক তথ্য সংস্কৃত এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে অনুভব করেছি এখানে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো বিশেষভাবে সংকলিত করলে জিজ্ঞাসু পাঠকদের পাঠযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হবে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেই গ্রন্থের কিছু সিদ্ধান্ত-সূত্র এখানে উল্লেখ করা হলো -

- যে ঈশ্বরের উপাসনা করে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
- যে পরোপকারী সে সর্বদা সুখী হয়।
- যে ধর্ম পালন করে সে সুখ প্রাপ্ত হয়।
- যে যোগ অভ্যাস করে সে জ্ঞান চর্চায় উৎসুক হয়।
- যে মদ্যপান করে তার বুদ্ধি নষ্ট হয়।

● বুদ্ধিমান লোক ততটুকু ভোজন করে যতটুকু সে হজম করতে পারে।

● যে শারীরিক পরিশ্রম করে না সে দৈহিক সুখ প্রাপ্ত করে না।

● যে মন থেকে পুরুষার্থ করে না তার মন দৃঢ় হয় না।

● যে পায়ে হাঁটে সে নিরোগ থাকে।

● কারোরই ময়লা কাপড় পড়া উচিত নয়।

● যিনি পূর্ণ বিদ্বান এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, পরোপকার করার জন্য তার সন্ন্যাস আশ্রয় গ্রহণ করা শাস্ত্রোক্ত কর্ম।

● যেরকম সন্ন্যাসাশ্রমী লোকদের দ্বারা উপকার হয় সেরকম গৃহাশ্রমীদের দ্বারা হয় না কেননা সাংসারিক কর্মের জন্য তাদের সর্বত্র বিচরণ করা সম্ভব হয় না।

● এটা তো পশু-পাখিদেরও স্বভাব যখন কেউ তাদের ঘর লুণ্ঠন করার ইচ্ছা করে তখন সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ অর্থাৎ লড়াই করে।

● 'সভা' শব্দের অর্থ - যা সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রকাশ্যে একত্রে সমবেত হওয়া।

● প্রতিদিন সত্য, প্রিয় এবং মাধুর্যময় কথা বলা উচিত।

● এই সংসারে [এক গৃহস্থের ক্ষেত্রে] স্বামী-স্ত্রীর নির্মল ভালবাসার মতো সুখ দ্বিতীয় কোনো সুখ নেই।

● মাতা-পিতার সেবা যত্ন কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়।

● যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং যাঁর গুণ, কর্ম, স্বভাব সত্য তাঁকে 'ঈশ্বর' বলে।

● ধর্ম, উত্তম ব্যবহার এবং পরোপকারের সাথে যাকে যেমন ব্যবহারের যোগ্য তাকে তেমনি দেওয়া উচিত।

● বেদোক্ত, ন্যায়ানুকূল, পক্ষপাতরহিত এবং যা পরের উপকার তথা সত্যাচরণযুক্ত তাকেই 'ধর্ম' হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

তপস্যা কী ?

তপস্যা শব্দের অক্ষরিক অর্থ লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত শৃঙ্খলার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

তপস্যা সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে-

“স্বাধ্যায়ো হৈব তেষাং পরমতা কাষ্ঠা”

[শ০ ব্র০ ১১.৫.৭.২]

স্বাধ্যায়ই পরম তপস্যা।

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করা।

আমাদের ইতিহাস গ্রন্থ মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রুক্মিণী দেবীর কঠোর তপস্যা দেখতে পাই,

ব্রহ্মচর্যং মহদ্ঘোরং তীর্বা দ্বাদশবার্ষিকম্।

হিমবৎপার্শ্বমাস্থায় যো ময়া তপসাঽঽর্জিতঃ॥

সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোঽস্বজায়ত।

সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ॥

[মহাভারত– সৌপ্তিকপর্ব ১২/২৯,৩০]

হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে ১২ বছর কঠোর তপস্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণ, সমান তপস্যা করলেন শ্রীমতি রুক্মিণী দেবী, তাঁদের ব্রহ্মচর্য পালনের অর্জিত গুণে তাঁদের ঘর আলো করে এল সনৎকুমারের ন্যায় তেজস্বী পুত্র শ্রী প্রদ্যুম্ন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে তপস্যা তিন প্রকার।

১. সাত্ত্বিক তপস্যা

২. রাজসিক তপস্যা এবং

৩. তামসিক তপস্যা

সাত্ত্বিক তপস্যা:

ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

(গীতা ১৭/১৭)

সাত্ত্বিক তপস্যা আবার তিন প্রকার-

১. শারীরিক তপস্যা

২. বাচনিক তপস্যা এবং

৩. মানসিক তপস্যা

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥

[গীতা ১৭/১৪]

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা; শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা-এগুলো শারীরিক তপস্যা বলে কথিত হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥

[গীতা ১৭/১৫]

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর যে বাক্য এবং স্বাধ্যায়ের অভ্যাসই বাচনিক তপস্যা বলে কথিত হয়।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥

[গীতা ১৭/১৬]

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌনতা, আত্মসংযম, অন্তঃকরণের পবিত্রতা-এই সকল মানসিক তপস্যা বলে কথিত হয়।

রাজসিক তপস্যা:

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥

[গীতা ১৭/১৮]

সৎকার, সম্মান ও পূজা পাবার আশায় অথবা দম্ভপূর্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই অনিশ্চিত এবং ক্ষণিক ফলবিশিষ্ট তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলে।

তামসিক তপস্যা:

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।

পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥

[গীতা ১৭/১৯]

যে তপস্যা মুর্খতাপূর্বক আগ্রহ দ্বারা, মন, বাণী ও দেহকে কষ্ট দিয়ে অথবা অপরের অনিষ্টের জন্য করা হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলে।

গীতায় অষ্টাঙ্গযোগ

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই আট অঙ্গের বর্ণনা অষ্টাঙ্গযোগের প্রতিপাদ্য বিষয়-"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" (যোগদর্শন: ২/২৯)। গীতায় ভগবান অষ্টাঙ্গ যোগের ক্রমানুসারে বর্ণনা করেননি, কিন্তু ভগবানের বাণীর বিশেষত্ব এমনই যে অন্য যোগ সাধনের বর্ণনার সঙ্গে অষ্টাঙ্গযোগের বর্ণনাও তাঁর বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন:

১. যম: অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ-এই পাঁচটি 'যম'-এর অন্তর্ভুক্ত "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (যোগদর্শন: ২/৩০)। গীতায় 'অহিংসা' (১০/৫; ১৩/৭; ১৬/২; ১৭/১৪) পদে 'অহিংসা'-এর; 'সত্যম্' (১৬/২; ১৭/১৫) পদদ্বারা 'সত্য'-এর; 'স্তেন এব সঃ' (৩/১২) পদে বিধিমুখে 'অস্তেয়'-এর; 'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ' (৬/১৪), 'ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' (৮/১১), 'ব্রহ্মচর্যম্' (১৭/১৪) পদদ্বারা 'ব্রহ্মচর্য'-এর এবং 'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ' (৪/২১), 'অপরিগ্রহঃ' (৬/১০) 'অহঙ্কারং.....পরিগ্রহম্। বিমুচ..... (১৮/৫৩) পদদ্বারা 'অপরিগ্রহ'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

২. নিয়ম: শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান-এই পাঁচটিকে 'নিয়ম' বলা হয় "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" (যোগদর্শন: ২/৩২)। গীতায় 'শৌচম্' (১৩/৭, ১৬/৩; ১৭/১৪, ১৮/৪২) পদদ্বারা 'শৌচ'-এর; 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' (৪/২২); 'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ' (৩/১৭), 'তুষ্যন্তি' (১০/৯), 'সন্তুষ্টঃ' (১২/১৪), 'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' (১২/১৯) পদদ্বারা 'সন্তোষ'-এর; 'যত্তপস্যসি' (৯/২৭), 'তপঃ' (১৬/১; ১৭/১৪-১৬) পদদ্বারা 'তপঃ'-এর; 'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ' (৪/২৮) 'স্বাধ্যায়াভ্যসনম্' (১৭/১৫), 'অধ্যষ্যতে চ য ইমং ধর্মং সংবাদমাবয়োঃ' (১৮/৭০) পদদ্বারা 'স্বাধ্যায়'-এর; 'মামাশ্রিত্য যতন্তি' (৭/২৯), 'তমেব শরণং গচ্ছ' (১৮/৬২), 'মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮/৬৬), পদগুলোর দ্বারা 'ঈশ্বর-প্রণিধান'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. আসন: শরীর স্থির ও সুখযুক্ত হওয়াকে 'আসন' বলা হয় 'স্থিরসুখমাসনম্' (যোগদর্শন: ২/৪৬)। গীতায় 'সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্' (৬/১৩)-এই শ্লোকটিতে 'আসন'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. প্রাণায়াম: শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিরুদ্ধ করার নাম 'প্রাণায়াম'-"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" (যোগদর্শন: ২/৪৯) । গীতায় 'প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ' (৪/২৯) 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা' (৫/২৭), 'ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্' (৮/১০) 'মুার্দ্ধায়াত্মনঃ প্রাণম্' (৮/১২) পদের দ্বারা 'প্রাণায়াম-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. প্রত্যাহার: ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসাকে 'প্রত্যাহার' বলে-"স্ববিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (যোগদর্শন: ২/৫৪)। গীতায় 'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ' (২/৫৮, ৬৮), 'তানি সর্বাণি সংযম্য' (২/৬১), 'শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিযাণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' (৪/২৬) পদগুলোর দ্বারা 'প্রত্যাহার'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. ধারণা: স্থান বিশেষে বাঁধা মনকে বলা হয় 'ধারণা'-"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (যোগদর্শন: ৩/১)। গীতায় 'মনঃ সংযম্য' (৬/১৪), 'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ' (৬/২৬) 'মচ্চিত্তাঃ' (১০/৯), 'ময়্যেব মন আধৎস্ব' (১২/৮) 'মচ্চিত্রঃ সততং ভব' (১৮/৫৭), 'মচ্চিত্তঃ' (১৮/৫৮) পদগুলোর দ্বারা 'ধারণা'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. ধ্যান: সেই স্থানে জ্ঞানের এক সমান অবস্থা চলতে থাকাকে বলা হয় 'ধ্যান'-"তত্র প্রত্যযৈকতানতা ধ্যানম্" (যোগদর্শন: ৩/২) । গীতায় 'তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা' (৬/১২), 'চেতসা নান্যগামিনা' (৮/৮), 'মাং ধ্যায়ন্তঃ' (১২/৬), 'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি' (১৩/২৪), 'ধ্যানযোগপরো নিত্যম্' (১৮/৫২), ইত্যাদি পদগুলোর দ্বারা 'ধ্যান'-এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. সমাধি: ধ্যান করতে করতে চিত্ত যখন ধ্যেয় বস্তুতে তদাকার হয়ে যায়, তখন চিত্তবৃত্তির জ্ঞান থাকে না; ধ্যানের সেই অবস্থার নাম 'সমাধি'-"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূণ্যমিব সমাধিঃ" (যোগদর্শন: ৩/৩)। গীতায় 'আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে' (৪ |২৭) পদগুলোতে 'সমাধি' বর্ণিত হয়েছে।

[লেখাটি শুদ্ধধ্বনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে নেওয়া]

নিজের দোষের সমাধান না করে পালটা অন্যের দোষ বের করাকে কী বলে ?

ন্যায়দর্শনে একে **'মতানুজ্ঞা'** বলা হয়েছে।

প্রতিষেধং সদোষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা॥

স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতুনির্দেশে পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎসমানো দোষঃ॥

- **ন্যায়দর্শন ৫।১।৪২-৪৩**

স্বপক্ষেদোষাভ্যুপগমাৎপরপক্ষেদোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥

- **ন্যায়দর্শন ৫।২।২১**

অর্থাৎ, ক যদি খ-কে কোন দোষ দেখায় তবে খ সেই দোষের আরোপের সমাধান বা খণ্ডন না করে যদি বলে তোমার পক্ষেও এই একই দোষ আছে তখন তাকে 'মতানুজ্ঞা' নামের নিগ্রহস্থান বলা হয়। এখানে খ পক্ষ ক-এর উপর একই দোষ দিয়ে স্বীকার করেছে যে ক-এর আরোপ সঠিক। নিজ পক্ষ শুদ্ধ প্রমাণ না করে পরপক্ষকে দোষ দেওয়ার মাধ্যমে নিজের পক্ষকে শুদ্ধ প্রমাণ করা যায় না । একে মতানুজ্ঞা নামের নিগ্রহস্থান তথা পরাজয়ের স্থান বলে ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

আমরা কি ঈশ্বরের হাতের পুতুল ? তিনি যা করান তাই করি ?

প্রায়ই সবাই এমন বলে যে, আমরা ঈশ্বরের হাতের কাষ্ঠপুতুল। সবকিছু ঈশ্বরই করেন বা করান আমরা কিছুই করতে পারি না। তার ইচ্ছা ব্যতীত পাতাও নড়তে পারে না!

নির্মূলন: আত্মা অল্পজ্ঞ, অতএব আমাদের মানা অথবা না মানায় কারোর সন্তুষ্টি হতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস করে - ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তার আত্মা সত্যাসত্যের জ্ঞাতা হয়।

১) সর্বনিয়ন্তা ও সর্বশক্তিমান্ হওয়ায় যে খুশি এই বাগধারার প্রয়োগ করছে যে, তার (প্রভু) ইচ্ছা ব্যতীত পাতাও নড়তে পারে না। একটু গভীরভাবে বিচার করুন আমরা কী পাতা নাড়াতে পারি না? আমরা তো গাছের পর গাছ কেটে ফেলে দিই, তবে পাতা না নড়বার কথা তো মিথ্যা হয়ে গেল! (পরে নিবারণ দেওয়া হবে)

২) আমরা যখন ভালো কাজ করি তখন নিজের প্রশংসা করি আর যখন কোন কাজ ঠিক হয় না ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করি যে, প্রভুর ইচ্ছা! এর তাৎপর্য এই যে, আমরা তো ভালো কাজ করি, সেই প্রভুই আমাদের কার্যে বাধা উৎপন্ন করে আর সাজানো-গোছানো কাজ বিগড়ে দেয় আর আমরা সেই কাজে অসফল হয়ে যাই। (পরে নিবারণ দেওয়া হবে)

৩) আমরা সবাই ঈশ্বরের কাষ্ঠপুতুল তবে ভালো-মন্দ তিনিই করছেন। আমাদের কোনও চিন্তা করা উচিত নয়! আমাদের ব্যবসা, ব্যাংক-ব্যালান্স, গৃহের পান-আহার যাবতীয় সব তিনিই করবেন। তাই না? (নিবারণ পড়ে দেওয়া হবে)

যেসব লোক এই ধরণের ভ্রান্তি মস্তিষ্কে পালন করছেন, তারা সবাই নাস্তিক লোক - অকর্মণ্য লোক অথবা স্বার্থপর প্রবৃত্তির লোক যারা নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য সাধারণ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। লোক আর্ষগ্রন্থের স্বাধ্যায় তো করেই না - গুজবে বিশ্বাস করে আর পোপলীলায় আবদ্ধ হয়।

🔸 চেতন সত্তা দুই প্রকার (১) ঈশ্বর ও (২) জীবাত্মা। সৃষ্টি-নির্মাণ ঈশ্বর করেন এবং প্রকৃতির নিয়ম তৈরি করেন যে অনুযায়ী সৃষ্টি-ক্রম চলতে থাকে। যেখানে বায়ুর চাপ কম হয়ে যায় সেই দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং গাছের পাতা নড়তে থাকে। এইভাবে ঝড় ওঠে, বায়ু-চক্রের নির্মাণ হয়, সামুদ্রিক-ঝড় ওঠে। এই সবকিছুর অনেক কারণ থাকে। এগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আসতেই থাকে। এই স্থলে প্রকৃতির নিয়মও চলে এবং সঙ্গে মানুষের কর্মও

থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মকে যেখানে ভঙ্গ করা হয় সেখানে পরিণামস্বরূপ, বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। বাকী রইলো পাতা নড়ার কথা, তো ছোট শিশুও পাতা নড়াতে পারে – পাতা ভাঙতে পারে – পাতা ছিঁড়তে পারে। মনুষ্য স্বাধীন প্রাণী, তার কর্ম করার স্বাধীনতা রয়েছে, তারা স্বাধীন। তারা করুক, না করুক অথবা উল্টোটাই করুক, এসব কিছুই মানুষের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। পাতা ঈশ্বরের ইচ্ছেতে নড়ে- নড়ে না-পাগলের প্রলাপ। যেসব অন্ধবিশ্বাসী এবং অন্ধভক্ত লোক একে খুব বড় বিষয় মনে করে, তার বুদ্ধির উপর করুণা হয়।

যদি কর্মী-যে করায় তিনি ঈশ্বর তবে কর্মফলও তার ভোগ করা উচিত। যে কর্ম করে, সে ফল পায় এই হলো বিধির বিধান। কর্ম করবেন ঈশ্বর আর তার ফল ভোগ করবে মানুষ এটা তো অন্যায় হলো। যখন কোন কাজ ভালো হয় এবং যার ভালো ফল লাভ হয় তখন আমরা এরূপ বলি যে, কাজ আমি করেছি। এ পর্যন্ত তো ঠিক আছে, কিন্তু যখন কোন কাজ গুলিয়ে যায়, ফল বিপরীত লাভ হয় তখন আমরা নিজের দোষ দিই না, নিজের দোষ স্বীকার করি না – বরং বলে থাকি যে, যা প্রভুর ইচ্ছা সেটাই হল! সমস্ত দোষ প্রভুর উপর ছেড়ে দিই আর নিজে বদনাম হওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। মানব কতখানি স্বার্থপর! ঈশ্বরকেও ছাড়ে না। পরমপিতা পরমেশ্বর সর্বদা সৎকর্ম-নিষ্কাম কর্ম করার প্রেরণা দান করেন। তিনি কাউকে ভুল মার্গ দেখান না। প্রত্যেকবার সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা বেদ দ্বারা মার্গ দর্শন করে এসছেন। এতটা অবশ্য যে, মানব যতটুকু যেমন কর্ম করে, পরমপিতা পরমাত্মা ততখানি এবং তেমন ফল প্রদান করেন। তিনি কারোর সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব করেন না, এইজন্য তো তাকে ন্যায়কারী বলা হয়। নিজের দোষ প্রভুর উপর চাপিয়ে দেওয়া পাপ- দোষ- যার শাস্তি অবশ্যই পাওয়া যায়। আমরা যদি সমস্ত প্রাণী ঈশ্বরের কাষ্ঠপুতুল হতাম তবে ঈশ্বর আমাদের এইরূপ আদেশ কেন দিতেন উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত হও, ওঠো, জাগো! পরমাত্মা আমাদের কর্ম করার প্রেরণা দান করেন। শুভ কর্ম করার প্রেরণা দেন। যদি তিনিই করান-করেন তবে আমাদের কোনও সময়ে কিছুই করা উচিত নয়। ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা করায় কী লাভ? ধন-সম্পদ একত্রিত করে কী লাভ? যে যা খুশি করুন না কেন আমাদের তাকে শিক্ষা দান করা উচিত নয়। চোর চুরি করলে তাকে ধরা উচিত নয়। কেউ হত্যা করলে কিছুই করা উচিত নয়, কারণ সব-কিছু ঈশ্বরই করেন বা করান। আমরা তার কার্যে বাধা প্রদান করবো কেন? ঈশ্বর যা করেন তা ঠিকই করেন! ঠিক আছে তাই না?

এমন বিচারধারা অবৈদিক। সত্য এই যে, কর্ম করায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীন। তার ফল লাভের জন্য পূর্ণরূপে পরাধীন। আমরা কাঠের পুতুল কেবল এই অর্থে যে, আমরা ক্ষণভঙ্গুর, অল্পজীবী, কিন্তু নিজের ছোট জীবনে আমরা এত মহান্ কর্ম করতে সক্ষম যে কারণে ঈশ্বরের অমৃতপুত্র বলা হয়। আমাদের নিজের ভাবনা পরিবর্তন করা উচিত, যাতে আমরা কাষ্ঠপুতুল হয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট না করি।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক।

কারো মৃত্যু হলে সেই বাড়িতে কি পূজা-পাঠ বন্ধ রাখা উচিত ?

প্রশ্নঃ কারো মৃত্যু হলে সেই বাড়িতে কি পূজা-পাঠ বন্ধ রাখা উচিত ? যে গৃহে মৃত্যু হয় সেই গৃহে ১০/১২/১৫/৩০ দিন পর্যন্ত পূজা পাঠ করা হয় না – সন্ধ্যা-যজ্ঞও করা অনুচিত – দীপ প্রজ্জ্বলন উচিত নয়!

সমাধান: এ সবই মনের ভুল, ভ্রান্তি। ১০/১২/১৫/৩০ দিন তো অনেক দূরের কথা সেই ঘরে তো প্রত্যেকদিন পূজা-পাঠ করা উচিত, প্রতিদিন প্রাত-সন্ধ্যা দুইবার অগ্নিহোত্র-সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যে ঘরে কারোর মৃত্যু হয় সেই ঘরের পরিবেশ শুদ্ধ করার জন্য যজ্ঞ তো অবশ্যই করা উচিত। যে কক্ষে মৃত্যু হয় সেই কক্ষকে সাবান-জল দ্বারা ভালোমতো পরিষ্কার করা উচিত- কীটনাশক দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। শুদ্ধ ঘৃতের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করা উচিত যেন অন্ধকার ভাব দূর হয়। যজ্ঞ তো সর্বশ্রেষ্ঠ-সর্বোত্তম কর্ম, কারণ হবনসামগ্রী জ্বললে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পরিবেশ শুদ্ধ এবং সুগন্ধিত হয়। অথর্ববেদেই [১২.২.২০] বলা হয়েছে, 'শুদ্ধা ভবত যজ্ঞিয়াঃ'= শুদ্ধ ও যজ্ঞশীল হও। অমুক তমুক দিন পর্যন্ত কেন, সর্বদা উপাসনাত্মক কর্ম করা উচিত। পূজা-পাঠ তো পবিত্র কর্ম, না করলেই নিজেরই ক্ষতি। নিয়মপূর্বক সন্ধ্যা করা উচিত। নিত্যকর্ম কখনো পরিত্যাগ করা চলবে না -

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।

নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥১॥

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যাযো ব্রহ্মসত্রং হি তৎস্মৃতম্।

ব্রহ্মাহুতিহুতং পূণ্যমনধ্যাযবষট্কৃতম্॥২॥ মনু০ [২। ১০৫-১০৬]

অর্থ - বেদের পঠন-পাঠন, সন্ধ্যোপাসনাদি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা এবং হোমমন্ত্র সম্বন্ধে অনধ্যায় এবং নিরোধ অর্থাৎ অননুষ্ঠান [= অনুষ্ঠানের ত্যাগ এবং নিষেধ] নাই, কেননা নিত্যকর্মে অনধ্যায় হয়না ॥১॥

যেরূপ সর্বদা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, কখনও বন্ধ করা যায় না, সেইরূপ প্রতিদিন নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। নিত্যকর্ম একদিনও পরিত্যাগ করিবে না। কেননা অনধ্যায়েও অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্ম পুণ্যরূপ হয়। যেরূপ মিথ্যা বলিলে সর্বদা পাপ এবং সত্য বলিলে সর্বদা পুণ্য হয়, সেইরূপ কুকর্মে সর্বদা অনধ্যায় ও সুকর্মে সর্বদা স্বাধ্যায়ই হইয়া থাকে॥২॥

ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনায় কোনও অবস্থায় অবহেলা করা উচিত নয়। মৃত্যুর পরিবেশে তো অবশ্যই করা উচিত। এর দ্বারা মনে শান্তি প্রাপ্ত হয় – ধৈর্য প্রাপ্ত হয় - আত্মিক বল পাওয়া যায়, যার ফলে বিদেহী আত্মার চলে যাওয়ার দুঃখ কম হয়। এই সময় ঈশ্বরের উপাসনা থেকে ভক্তকে দূরে সরিয়ে রাখা বরং অন্যায়। কেউ কেউ বলেন এসময় মন অস্থির থাকে তাই উপাসনা করা যায় না, তাদের কাছে প্রশ্ন ঈশ্বর কি আমাদের উপাসনা পাওয়ার ভিখারি ? অবশ্যই না। তাকে আমরা চাই যেন তাকে পেয়ে আমি আনন্দ লাভ করতে পারি। যখন আমার কেউ মারা গিয়েছো, আমার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত তখনই আমার ঈশ্বরকে বেশী ডাকা উচিত যেন আমি সম্বিৎ না হারাই, আমার মনে যেন মানসিক বল আসে, তাকে অবলম্বন করে যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারি।

অনেকে বেদপাঠ নিষিদ্ধ করেন, গীতা পড়তে বলেন। অথচ গীতাতেই বেদের উল্লেখ আছে। তাহলে কেন পড়বো না ? আমার জন্য বৈদিক বিধান আগে নাকি প্রক্ষিপ্তাদি যুক্ত স্মার্ত বিধান ? কেউ কেউ আবার শাস্ত্রীয় কর্ম বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক বা গুরুবাদী কর্ম করতে বলেন ধর্মীয় কর্মের জায়গায়। এটাও সরাসরি সনাতন শাস্ত্র বিরোধী। যদি কোন মতবাদ অনুযায়ী তথাকথিত ঈশ্বরকে আমি আমার দুর্বলতার সময়ে নিজের মাতা - পিতা -সখাভাবে আত্মিক প্রয়োজনে ডাকতেই না পারি, তার উপাসনাই করতে না পারি তাহলে সেই তথাকথিত ঈশ্বর দিয়ে কী করবো ? সেই ঈশ্বর বেদ প্রতিপাদিত অবশ্যই না। কেননা বেদ [ঋ০ ১০.১৫১.৫] নিজেই বলে ঈশ্বরকে সব সময় স্মরণ করতে।

'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি ছান্দোগ্য০ ২।২৩।১' অর্থাৎ, ধর্মের ৩ স্কন্ধ - যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। পুণ্য কাজ নিত্য করা উচিত অর্থাৎ দান-পুণ্য অবশ্যই করা উচিত যার দ্বারা গৃহস্থের সুসংস্কার লাভ হয়। মনে রাখবেন, কর্তাই কর্মফল লাভ করে। বিদেহী আত্মার জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। যা জ্বলে ছাই হয়ে গেছে, তার নামে পুণ্যকর্ম করলে – দান-দক্ষিণা দিলে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় না। যে কর্তা সেই ফল লাভ করে। প্রমাণ স্বরূপ -

১. তস্যেদর্বন্তো রংহয়ন্ত আশবস্তস্য দ্যুম্নিতমং যশঃ । ন তমংহো দেবকৃতং কুতশ্চন ন মর্ত্যকৃতং নশৎ ~ ঋগ্বেদ ৮.১৯.৬

২. যসয় কুর্মা গৃহে হবিস্তমগ্নে বর্ধয়া ত্বম্ । তস্মৈ দেবা অধি ব্রবন্নয়ঞ্চ ব্রহ্মণস্পতিঃ ~ যজুর্বেদ ১৭.৫২

৩. উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্ যজ্ঞেন বোধয় । আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্তিং যজমানং চ বর্ধয় ~ অথর্ববেদ ১৯.৬৩.১

৪. তস্মাৎসর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ - গীতা ৩.১৫

৫. অযজ্ঞিয়ো হতবর্চা ভবতি ~ অথর্ববেদ ১২.২.৩৭ = যে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও মানবকল্যাণরূপ যজ্ঞ করে না সে তেজস্বী হতে পারে না।

মহর্ষি দয়ানন্দ এবং নারী শিক্ষায় তাঁর চিন্তাধারা

ভগবৎপাদ মহর্ষি স্বামী শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী নারী শিক্ষার উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। প্রাচীনকালে স্ত্রীগণ শিক্ষিত হতেন; এই ব্যাপারটির দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করে 'উপদেশমঞ্জরী' তথা 'পুনাপ্রবচন'-এর তৃতীয় প্রবচনে তিনি বলেন-

"পূর্বকালে আর্যদের মধ্যে নারীরা উৎকৃষ্ট রীতিতে পড়াশুনা করতো। আর্যদের ইতিহাসের দিকে তাকিয়েদেখো, নারীরা আজন্ম ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণ করে থাকতো এবং সাধারণ মেয়েদেরও উপনয়ন, গুরুগৃহে বাস সংস্কারাদি হতো। গার্গী, সুলভা, মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী প্রভৃতি বড়ো বড়ো সুশিক্ষিত স্ত্রীগণ মহান মহান ঋষি-মুনিদের শঙ্কাগুলোর সমাধান করতো।**"**

স্বামীজির সময়ে নারীশিক্ষার প্রচার নামমাত্রও ছিলো না। তিনিই প্রথম শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে বলেন, **"**সকল বর্ণের নরনারীদের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের প্রচার হওয়া আবশ্যক।**"** সত্যার্থ প্রকাশের ৩য় সমুল্লাসে প্রশ্ন উঠানো হয়েছে-

"প্রশ্ন: স্ত্রী শূদ্রও কি বেদ পাঠ করবে? এরা যদি বেদপাঠ করে, তবে আমরা কী করব? আর তাদের বেদপাঠ বিষয়ে কোনো প্রমাণও নেই, বরং নিষেধ আছে। 'স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ'=স্ত্রী ও শূদ্র পড়বে না- এটি শ্রুতির বচন।"

বলা বাহুল্য, এই ধরনের বানানো নিষেধাজ্ঞা তখন সমাজে শাস্ত্রের নামে অত্যধিক প্রচলিত ছিলো । আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদে [৬.৪.১৭] বিদ্যমান 'পণ্ডিতা=পণ্ডিত কন্যা'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেদ প্রতিপাদিত শিক্ষিত নারীর প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে নারীর বেদে ব্রহ্মোক্ত অধিকার নিষেধ করে বলেন,

" দুহিতুং পাণ্ডিত্যং গৃহতন্ত্রবিষয়মেব, বেদেঽনধিকারাৎ।

অর্থাৎ, দুহিতার পাণ্ডিত্য কথায় গার্হস্থ্য-শাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাই বুঝিতে হইবে, কারণ স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। "

এর বিপরীতে যুগশ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যকার ব্রহ্মদর্শী মহর্ষি দয়ানন্দের নির্মল সিদ্ধান্ত কী ছিলো ? নিজেই দেখুন -

বিদুষামিয়মেব যোগ্যতাস্তি সর্বান্কুমারান্ কুমারীশ্চ বিদুষীঃ সম্পাদয়েৎ যতঃ সর্বে বিদ্যায়াঃ ফলং প্রাপ্য সুমতয়ঃ স্যুরিতি ॥

ঋগ্বেদ ৩.১.২৩ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, বিদ্বানদের উচিত সকল কুমার-কুমারীকে বিদ্বান-বিদুষী তৈরি করা, যাতে তারা সর্ববিদ্যার ফল লাভ করে সুমতিযুক্ত হয়।

অহো ! সনাতনধর্ম পরিমণ্ডলে পরমেশ্বরের কী অসীম কৃপা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীভগবানের কৃপাবলে বেদের যথাযথ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে সেই তত্ত্ব রসামৃত স্বীয় বেদভাষ্য ও গ্রন্থাদিতে দিয়ে গিয়েছেন।

মহর্ষি দয়ানন্দ সেই প্রলয়ঙ্করী সমাজের পাপদেহের বক্ষ চিরে বজ্রনিনাদে উদ্‌ঘোষ করেন -

" স্ত্রী-পুরুষ সকলের অর্থাৎ মানবমাত্রের বেদ পড়ার অধিকার আছে। তুমি অধঃপাতে যাও! এই শ্রুতি তোমার কপোলকল্পিত, কোনো প্রামাণিক গ্রন্থের নয়।"

পুনরায় নারীশিক্ষার বিরোধীদের ভর্ৎসনা করে বলেন -

"তোমরা যে স্ত্রীদের বেদপাঠ করতে নিষেধ করছ, তা তোমাদের মূখর্তা, স্বার্থপরতা এবং নির্বুদ্ধিতার প্রভাব।"

মহর্ষি ছেলেমেয়ে সবার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অত্যাবশ্যক বলেছেন। যে মাতাপিতা সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়, তাদের রাজদণ্ড দেওয়া উচিৎ বলে সিদ্ধান্ত দেন, পাশাপাশি বলেন -

"রাজার উচিত সমস্ত বালক-বালিকাদের উক্ত সময় থেকে উক্ত সময় পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যে রেখে বিদ্বান করা। যদি কেউ এই অনুশাসন না মানে, তবে তার মাতা পিতা দণ্ডনীয় হবে অর্থাৎ রাজার আজ্ঞানুসারে আট বছর বয়সের পর কারো পুত্র কন্যা গৃহে থাকতে পারবে না। কিন্তু তারা আচার্যকুলে থাকবে। সমাবর্তনের সময় না আসা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবে না।"

রাজার দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

রাজা তথা যত্নমাতিষ্ঠেদ্ যথা স্বকীয়াঃ সেনাঃ সুশিক্ষিতা বিজয়িন্যো বলবত্যো ভবেয়ুঃ সর্বে বালকাঃ কন্যাশ্চ ব্রহ্মচর্যেণ বিদ্যাযুক্তা ভূত্বা সমৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ সত্যং ন্যায়ং ধর্মং সততং সেবেরন্ ॥

ঋগ্বেদ ৬.৪৪.১৮ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, রাজার যত্নের সাথে চেষ্টা করবেন যাতে, তাঁর সেনা সুশিক্ষিত, বিজয়ী ও বলশালী হবে; সকল বালক-কন্যা ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে বিদ্যাযুক্ত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের নিরন্তর আচরণ করবে।

শিক্ষিত নারীর পাশাপাশি শিক্ষিত ধাত্রীর উল্লেখ করে, মহর্ষি যজুর্বেদ ১০.৭-এর ভাষ্যভাবার্থে লিখেছেন,

রাজ্ঞা প্রয়ত্নেন স্বরাজ্যে সর্বাঃ স্ত্রিয়ো বিদুষ্যঃ কার্য্যাস্তাসাং সকাশাজ্জাতা বালকা বিদ্যাযুক্তধাত্র্যধীনাঃ কার্য্যাঃ, যতো ন কস্যাপ্যপত্যং বিদ্যাসুশিক্ষাহীনং স্ত্রী নির্বলা চ স্যাৎ॥

অর্থাৎ, রাজা স্বীয় রাজ্যে অতিযত্নের সাথে সর্ব স্ত্রীকে বিদুষী করবেন। তাদের দ্বারা জাত সন্তানদের বিদ্যাযুক্তা ধাত্রীদের অধীনে রাখবেন, যাতে কারোও সন্তান বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষায় বঞ্চিত না হয় এবং স্ত্রীও দুর্বল না হয়।

মহর্ষি দয়ানন্দ ভাষ্যের নিম্নলিখিত বচনও দ্রষ্টব্য, যার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে নারীশিক্ষাকে তিনি কতোটা গুরুত্ব দিতেন-

যাবত্যঃ কুমার্য্যস্তন্তি বিদুষীণাং সকাশাদধীরন্ তা ব্রহ্মচারিণ্যো বিদুষীরেবং প্রার্থয়েয়ুর্ভবত্যোঽস্মান্ বিদ্যাসুশিক্ষায়ুক্তান্ কুরুতেতি ॥

ঋগ্বেদ ২.৪১.১৬ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, যত কুমারী আছে তারা বিদুষীদের কাছে অধ্যয়ন করবে এবং সেই কুমারী ব্রহ্মচারিণীরা বিদুষীদের কাছে প্রার্থনা করবে যে আমাদের আপনারা সর্ববিদ্যা ও সুশিক্ষা যুক্ত করুন।

মা-বাবার দায়িত্ব সম্পর্কে লিখেছেন,

যদা মাতাপিতরঃ স্বপুত্রান্ কন্যাশ্চ সুশিক্ষ্য পুনর্বিদুষো বিদুষ্যশ্চ সমীপে চিরং সংস্থাপ্যাধ্যাপয়েয়ুস্তদা তাঃ সূর্য্য ইব কুলদেশোদ্দীপকাঃ স্যুঃ॥

যজুর্বেদ ১১.৩৬ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, যদি মাতা-পিতা স্বীয় সন্তানদের উত্তম শিক্ষাদানের পর বিদ্বান ও বিদুষীদের আশ্রয়ে রেখে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করায় তাহলে সেই পুত্র-কন্যাগণ সূর্যবৎ নিজ কুল ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

যা ইহ প্রশংসিতাঃ স্ত্রিয়ো যে চ পুরুষাস্তে স্বসদৃশৈস্সহ সংযুজ্যন্তাং ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যযা বিজ্ঞানমুন্নীয়ৈশ্বর্যং বর্দ্ধয়ন্তু ॥

ঋগ্বেদ ১.১৫১.৬ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, প্রশংসিত নারী-পুরুষগণ তাদের সমতুল্য পুরুষ-নারীদের সাথে সংযুক্ত হবে, ব্রহ্মচর্য ও বিদ্যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নতি করে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করবে।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বলেছেন,

গুরুভির্গুরুপত্নীভিশ্চ বেদোপবেদবেদাঙ্গোপাঙ্গশিক্ষয়া দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাত্মমনঃশুদ্ধিশরীরপুষ্টিপ্রাণ- সন্তুষ্টীঃ প্রদায় সর্বে কুমারাঃ সর্বাঃ কন্যাশ্চ সদ্গুণেষু প্রবর্ত্তয়িতব্যা ইতি॥

যজুর্বেদ ৬.১৪ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, গুরু ও গুরুপত্নীর উচিত তাঁরা যেন বেদ ও উপবেদ তথা বেদের অঙ্গ ও উপাঙ্গের শিক্ষা দান করে দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও মনের শুদ্ধি ও শারীরিক পুষ্টি তথা প্রাণের সন্তুষ্টি দান করে কুমার ও কুমারীদের উত্তম উত্তম গুণ সমূহে প্রবৃত্ত করান।

বিশেষত, বেদাঃ-ঋগ্যজুঃ সামার্থর্বাণঃ, উপবেদাঃ-অর্থবেদধনুর্বেদগান্ধর্ববেদায়ুর্বেদাঃ, বেদাঙ্গানি-শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষামিতি, উপাঙ্গানি-মীমাংসাবৈশেষিক ন্যায়পাতঞ্জলসাংখ্যবেদান্তাঃ।

স্বামীজীর কালে তৎকালীন পণ্ডিত স্ত্রীগণকে বেদাধ্যয়নের অধিকার দিত না। এজন্যই সত্যার্থ প্রকাশের ৩য় সমুল্লাসে আবার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে,

"প্রশ্ন: স্ত্রীও কি বেদ পাঠ করবে?

উত্তর: অবশ্যই , দেখ শৌত্রসূত্রাদিতে-

'ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ'

অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞে এই মন্ত্র পাঠ করবে। যদি বেদাদি শাস্ত্র না পড়ে থাকে, তাহলে যজ্ঞে স্বরসহ মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃতভাষণ কীভাবে করতে পারবে ?

ভারতবর্ষীয় নারীদের ভূষণস্বরূপিণী গার্গী বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পূর্ণ বিদুষী হয়েছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে [বৃ০ উ০ ৩.৬.১,৩.৮.১] এটি স্পষ্ট লিখিত আছে। দেখো, যদি পুরুষ বিদ্বান এবং স্ত্রী অবিদুষী অথবা স্ত্রী বিদুষী ও পুরুষ অবিদ্বান হয়, তবে নিয়ত দেবাসুর-সংগ্রাম লেগেই থাকবে, তাতে সুখ কোথায়? এজন্য যে স্ত্রীরা অধ্যয়ন করবে না, তারা বালিকাদের পাঠশালায় অধ্যাপিকা হবে কিভাবে? সেভাবেই রাজকার্য, বিচারকার্য, গৃহাশ্রমের কার্য, পতি ও পত্নীর পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন রাখা এবং সমস্ত গৃহকর্ম স্ত্রীর অধীনে রাখা ইত্যাদি কর্ম ব্যতীত বিদ্যা কখনও উত্তমভাবে সম্পাদিত হতে পারে না।"

স্ত্রী এবং পুরুষ দুইজনের জন্য বিস্তৃত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা স্বামীজি সত্যার্থ প্রকাশের তৃতীয় সমুল্লাস তথা সংস্কারবিধির বেদারম্ভ সংস্কারের অন্তর্গত করেছেন যাতে সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ, উপবেদ এবং ষড়দর্শন আদি অন্তর্ভুক্ত। তিনি লিখেছেন,

"দেখ, আর্যাবর্তের রাজপুরুষদের স্ত্রীগণ 'ধনুর্বেদ' অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাও ভালোভাবে জানতেন। যদি তারা না জানতেন, তাহলে দশরথ প্রভৃতির সাথে কৈকেয়ী প্রভৃতি যুদ্ধে কীভাবে যেতেন এবং যুদ্ধ করতে পারতেন? অতএব ব্রাহ্মণীকে সর্বপ্রকার বিদ্যা, ক্ষত্রিয়াকে সর্বপ্রকার বিদ্যা এবং যুদ্ধ তথা রাজবিদ্যা বিশেষ, বৈশ্যাকে ব্যবহারবিদ্যা এবং শূদ্রার রন্ধনাদি সেবাবিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

পুরুষদের পক্ষে যেমন ব্যাকরণ, ধর্ম এবং ব্যবহারবিদ্যা অন্ততপক্ষে কিছু কিছু শেখা অবশ্য কর্তব্য, তেমনই স্ত্রীদেরও ব্যাকরণ, ধর্ম, চিকিৎসা, গণিত এবং শিল্পবিদ্যা অবশ্যই শেখা কর্তব্য। কারণ সেসব বিদ্যা শিখলে সত্যাসত্যের নির্ণয়, স্বামী ও অন্যান্য সকলের প্রতি অনুকূল ব্যবহার, যথাযোগ্য সন্তানোৎপত্তি, সন্তানদের পালন-পোষণ ও সুশিক্ষাদান, গৃহের সকল কার্য যথোচিত সম্পাদন ও পরিচালন, 'চিকিৎসাবিদ্যা' অনুযায়ী ঔষধবৎ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা ও করানো যেতে পারে, এতে গৃহে কখনও রোগ প্রবেশ করবে না ও সকলে আনন্দিত থাকবে। 'শিল্পবিদ্যা' না জানলে গৃহ নির্মাণ করানো, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা এবং করানো, 'গণিতবিদ্যা' ব্যতীত সমস্ত হিসাব বোঝা ও বোঝানো, 'বেদাদিশাস্ত্র' বিদ্যা ব্যতীত ঈশ্বর ও ধর্মকে জেনে অধর্ম থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।"

যুগশ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যকার মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন, নারী-পুরুষ উভয়েরই উচিত রান্না শেখা ~

কুমারাঃ পুরুষশালাং কুমার্য্যশ্চ স্ত্রীশালাং গত্বা ব্রহ্মচর্য্যং বিধায় সুশীলতয়া বিদ্যাঃ পাকবিধিং চ গৃহ্ণীয়ুঃ। আহারবিহারানপি সুনিয়মেন সেবয়েয়ুঃ। ন কদাচিদ্বিষয়কথাং শৃণুয়ুঃ। মদ্যমাংসালস্যাতিনিদ্রাং বিহায়াধ্যাপকসেবানুকূলতাভ্যাং বর্ত্তিত্বা সুব্রতানি ধরেয়ুঃ॥

যজুর্বেদ ১১.৫৯ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, বালকেরা পুরুষদের এবং বালিকারা মেয়েদের পাঠশালায় যেয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে বিধিপূর্বক সুশীলতার সাথে বিদ্যা ও ভোজন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শিখবে এবং আহার বিহারও নিয়মানুসারে শিখবে। কখনো বিষয় কথা শ্রবণ করবে না। মদ্য, মাংস, আলস্য ও অতিনিদ্রা বর্জন করে, যাঁরা জ্ঞানদান করেন তাঁদের সেবা ও তাঁদের অনুকূল আচরণ করে উত্তম নিয়ম ধারণ করবে।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এদের মধ্যে কে বড় কে ছোট ?

সমাজরূপী দেহের মুখ ব্রাহ্মণ স্বরূপ, বাহু ক্ষত্রিয়, উদর বৈশ্য এবং পা শূদ্র তুল্য। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, শরীরের অঙ্গ মধ্যে মুখ—জ্ঞান প্রধান অঙ্গ, কেননা—মুখে কান, নাক, চোখ, জিভ প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান। আর এক কথা, শীত ও বর্ষা ঋতুতে সমস্ত শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, কিন্তু মুখ সকল সময় অনাবৃত থাকে। মুখ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি সকল ঋতুতেই নিজেকে অনাবৃত রাখে এবং শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করে। শুধু তাই নয়, মুখ যা কিছু গ্রহণ করে, সে কোনো কালেও নিজের কাছে সঞ্চয় করে রাখে না। বরং সে অন্যকে দান করে দেয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যার কাছে জ্ঞান, তপস্যা ও ত্যাগ আছে – সেই ব্রাহ্মণ।

বাহুকে ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা দেওয়ার অর্থ এই যে, বাহু অর্থাৎ হাত 'বল' প্রধান, শরীরে যখনই কোনো আক্রমণ হয়, তখনই প্রথমে হাত আক্রান্ত স্থান রক্ষার্থে উপস্থিত হয়। অতএব যে ন্যায়ানুসারে স্বীয় বা পরাক্রম দ্বারা প্রজার রক্ষা করে সেই 'ক্ষত্রিয়'।

পেটকে বলা হয়েছে 'বৈশ্য'। কেননা পেট সমস্ত ভোজ্য নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে। তারপর তাকে যথাযথভাবে পরিপাক করে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রয়োজনানুসারে সব ভাগ করে দেয়। অতএব যে ধন সঞ্চয় করে মানব সমাজে যথোচিতভাবে সঞ্চিত ধনকে বিতরণ করে থাকে, সেই 'বৈশ্য' পদ বাচ্য।

পাকে 'শূদ্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা,

প্রথমতঃ– পা সমস্ত শরীরের বোঝা নিয়ে বেড়ায়;

দ্বিতীয়তঃ– পরিশ্রম করে মাথা, পেট, হাত প্রভৃতি অঙ্গ যেখানে যেতে চায়, সেখানে তাদের পৌঁছে দেয়। শূদ্রের কাছে না আছে 'জ্ঞান' আর না আছে 'ধন' যে তা দিয়ে সে কাজ করবে। তার কাছে পরিশ্রম করার শক্তি আছে মাত্র। মোট কথা, যে সেবক, সে শূদ্র। ব্রাহ্মণ জ্ঞান দ্বারা, ক্ষত্রিয় বল দ্বারা, বৈশ্য ধন দ্বারা, আর শূদ্র পরিশ্রম দ্বারা মানব সমাজের সেবা করে, এইখানেই বর্ণের মহত্ত্ব।

যাঁর মধ্যে শম, দম, তপ, পবিত্রতা, শান্তি, কোমলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য পাওয়া যাবে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। যাঁর মধ্যে বীরত্ব, তেজস্বিয়তা, ধীরতা, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, তথা দানশীলতা এবং ন্যায়কারিতা, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার ভাব পাওয়া যাবে, সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়।

যাঁর মধ্যে কৃষি, গোরক্ষা, দান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নৈপুণ্য পাওয়া যাবে সে বৈশ্য।

আর যে নিজ শরীর দ্বারা সেবায় পটু, সে ব্যক্তি শূদ্র।

বর্ণ কেহই ছোট বড় নয়। আপন আপন কর্তব্য কর্মে সকলেই বড়। যথা—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ। বিচার-বিবেকের সময় "মস্তক' বড়, যখন রক্ষার সময় আসে তখন "হাত" বড়, যখন খাদ্যকে জানবার এবং শরীরের সঙ্গে যথাযোগ্য খাদ্য সার পাঠবার সময় আসে তখন "পেট" বড় এবং যখন পরিশ্রম দ্বারা শরীরের ভার বহনের বা গমনাগমনের সময় আসে তখন "পা" বড় হয় । এইভাবে মানুষের যখন সমাজকে জ্ঞানের দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "ব্রাহ্মণ" বড় । যখন বল দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "ক্ষত্রিয়" বড় । যখন ধন দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "বৈশ্য' বড় এবং যখন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "শূদ্র" বড় । বাস্তবিক পক্ষে স্বতন্ত্র রূপে বর্ণের মধ্যে পরস্পর কেহ কাহারও অপেক্ষা বড়ও নয়, ছোট ও নয় । স্বতন্ত্ররূপে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে, বৈশ্য বৈশ্যদের মধ্যে এবং শূদ্র শূদ্রদের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে ছোট বড় থাকতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে ছোট বড়ো সম্বন্ধ কী করে থাকতে পারে? যেমন নাকি— দু'জন ময়রা । একজন পারিশ্রমিক নেয় দু'টাকা প্রতিদিন, আর একজন নেয় চার টাকা । এদের মধ্যে কাকে বড় মানা যেতে পারে কী হিসাবে? না, কাজ হিসাবে । একজন ভাল কারিগর হিসাবে বড়, আর একজন মন্দ কারিগর হিসাবে ছোট । কিন্তু যদি কেহ বলে, ময়রা বড় না দর্জি? দর্জি পাঁচ টাকা রোজ নেয় অতএব দর্জি বড় । এদের মধ্যে কোথায় ময়রা আর কোথায় দর্জি? ময়রা আপন ক্ষেত্রে বড় । আপন আপন কর্তব্য কর্মে উভয়েই বড় । হ্যাঁ, দর্জিদের মধ্যে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অবশ্যই বড় ছোট স্বীকার্য । ঠিক তেমনি যোগ্যতা অনুসারে একই বর্ণের দুই ব্যক্তির মধ্যে ছোট বড় থাকা সম্ভব কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে ছোট বড়র কোনো সম্বন্ধই থাকতে পারে না। কেননা, তাদের গুণ কর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । সেক্ষেত্রে সকলেই আপন আপন কর্তব্য পালনে বড়,— ছোট কেহই নয়।

পবিত্র বেদ সনাতন ধর্মের সংজ্ঞাদাতা প্রধান ধর্মগ্রন্থ, এর সকল নীতিনৈতিকতা বোধের চরমতম উৎস। তাই পবিত্র বেদে চতুর্বর্ণ নিয়ে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা হয়েছে তা জানা প্রয়োজনীয়।

রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচ রাজসু নস্কৃধি।

রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্॥

[যর্জুবেদ ১৮.৪৮]

অর্থাৎ, হে ঈশ্বর ! আপনি আমাদের ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করুন, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করুন, বৈশ্যের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করুন, শূদ্রের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করুন এবং আমার মধ্যেও প্রতি স্থাপন করুন।

প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ।

যস্মৈ চ কাময়ামহে সর্বস্মৈ চ বিপশ্যতে॥

[অথর্ববেদ ১৯.৩২.৮]

অর্থাৎ হে অজ্ঞান বিদারক পরমেশ্বর ! ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের জন্য, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য, যাকে আমরা কামনা করি তার জন্য এবং সকলের জন্য আমাকে প্রিয় করো।

অর্থাৎ সকল বর্ণের সকলের সাথে প্রীতিময় সম্পর্ক রাখার কথা বলছে পবিত্র বেদ।

ঋগ্বেদের ১০.১৩.১ নং মন্ত্রের সেই বিখ্যাত বাণী-

“শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ”

~ শোন হে বিশ্ববাসী, তোমরা সকলে অমৃতের সন্তান।

অর্থাৎ পবিত্র বেদ বলছে আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। বেদ কোথাও বিভেদের কথা বলছে না।

ঋগ্বেদ ৫.৬০.৫ বলছে–

“অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সং ভ্রাতরো বাবৃধুঃ”

অর্থাৎ তোমরা সকলে ভাই ভাই, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়।

একে অপরকে ছোঁবেনা, অপরের ছোঁয়া খাবে না, ব্রাহ্মণ-শূদ্র অস্পৃশ্যতা এসবের কোন সুযোগ পবিত্র বেদে নেই।

কারণ অথর্ববেদ ৩.৩০.৬ বলছে–

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি। সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ ॥

[অথর্ববেদ ৩.৩০.৬]

অর্থাৎ হে মনুষ্য ! তোমাদের জলের পান একসাথে এক হোক, খাদ্য গ্রহণ একসাথে এক হোক। তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে (বেদবাণীতে) যুক্ত করেছি, তোমাদের অগ্নিহোত্র একসাথে হোক ঠিক যেভাবে রথচক্রের কেন্দ্রের চারপাশে অর সজ্জিত থাকে।

অথর্ববেদ আরও বলছে–

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্।

সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বম্ ॥

[অথর্ববেদ ৬.৬৪.২]

অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা-চেতনা এক হোক, তোমাদের মন এক হোক, তোমাদের সম্মেলন, আধ্যাত্মিকতা এক হোক, পান, ভোজন একসাথে হোক, সকলের লক্ষ্য এক হোক।

মূলত পবিত্র ঋগ্বেদের সংগঠনসূক্ত (১০.১৯০) ও পবিত্র অথর্ববেদের সংমনস্যম্ সূক্ত (৬.৬৪) পৃথিবীর প্রাচীনতম কোন লেখনী যাতে বলা হয়েছে সকল মানুষ সমান, সকলে যাতে একত্রে থাকে, সকলের মন এক হয়, সকলের সম্মিলন,।পান ভোজন একত্রে হয়, সকলের প্রার্থনা, যজ্ঞ যাতে একসাথে হয়, কারো মধ্যে যেন কোন ভেদাভেদ না হয়। অর্থাৎ পবিত্র বেদ অসংখ্য মন্ত্রে বারবার বলছে সকল মানুষ সমান, কোন অস্পৃশ্যতা, উঁচুনিচু ভেদাভেদ এসবের স্থান পবিত্র বেদে নেই।

যেহেতু পবিত্র বেদে বলা হয়েছে–

অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সং ভ্রাতরো বাবৃধুঃ।

[ঋগ্বেদ ৫.৬০.৫]

অর্থাৎ হে মনুষ্য ! তোমরা কেউ ছোট নও, কেউ বড় নও। সবাই ভাই ভাই।

অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট সংকেত দেখতে পারি, বর্ণ হবে গুণের ভিত্তিতে, কর্মের ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে, জন্মের ভিত্তিতে নয়। কেউ বড় নয়, কেউ ছোটও নয়, সকলের আছে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সমান গুরুত্ব। তাই বেদবিরুদ্ধ অযৌক্তিক অমানবিক বর্ণপ্রথা সমর্থনযোগ্য নয়।

লেখসত্ত্ব-

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

অগ্নিহোত্রে ২টি আজ্যভাগাহুতি দেওয়ার মাহাত্ম্য কী ? কী ফল পাওয়া যায় ?

অগ্নিহোত্রে আঘারাবাজ্যাহুতির পর যজ্ঞবেদীর মধ্যভাগে অগ্নিতে ২টি আহুতি দিতে হয়। একে আজ্যভাগাহুতি বলে। 'আজ্যভাগ' শব্দে অর্থ হলো ঘৃতাংশ। একটি আহুতি দেওয়া হয় প্রজাপতির উদ্দেশ্যে আরেকটি দেওয়া হয় ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে -

১. ওঽম্ প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥ ইদং প্রজাপতয়ে – ইদন্ন মম ॥

২. ওঽম্ ইন্দ্রায় স্বাহা ॥ ইদমিন্দ্রায়-ইদন্ন মম ॥

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে -

১। প্রজাপতি হলো প্রজাপালক পরমাত্মা [শ০ব্রা০ ১৩.৬.২.৮]

২। ইন্দ্র হলো জীবাত্মা [অষ্টা০ ৫.২.৯৩]

অর্থাৎ, এই দুটি আহুতির মাধ্যমে আমরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার যেন হয় এই প্রার্থনা করলাম। আমাদের অগ্নিহোত্র ও ধ্যান দুই স্থানেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়কে স্মরণে রাখা উচিত। কেননা মানুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল এবং যজ্ঞ করার সময় মন বিচলিত হতে পারে। এজন্য ব্রহ্মলাভের জন্য প্রজাপতি ও জীবাত্মা

উভয়কেই স্মরণ রাখতে হবে, নাহলে মুক্তি লাভ হবেনা। শাংখ্যায়ন আরণ্যকে [৩.৩] ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে [১.৩] প্রজাপতি ও ইন্দ্রকে ব্রহ্মলোকের দ্বারপাল বলা হয়েছে।

আধিদৈবিকে প্রজাপতি সূর্য [জৈ০ব্রা০ ২.৩৭০] আর ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থানীয় বায়ু [শ০ব্রা০ ৪.১.৩.১৯]। তাদের মাধ্যমেই সৃষ্টিযজ্ঞ চলমান। আধিভৌতিকে প্রজাপতি হলো রাজা [য০ ১৯.৭৫] আর ইন্দ্র বীর সেনাপতি [ঋ০ ১.৮৪.৪] যাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রযজ্ঞ চলমান থাকে।

আজ্যাভাগাহুতি সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,

চক্ষুষী হ বা এতে যজ্ঞস্য যদাজ্যভাগৌ । তস্মাৎপুরস্তাজ্জুহোতি পুরস্তাদ্ধীমে চক্ষুষী তৎপুরস্তাদেবৈতচ্চক্ষুষী দধাতি তস্মাদিমে পুরস্তাচ্চক্ষুষী...অস্মিংল্লোকে চক্ষুষ্মানভবতি সচক্ষুরমুষ্মিংলোকে সম্ভবতি য এবমেতৌ চক্ষুষী আজ্যভাগৌ॥

শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৬.৩.৩৮,৪১

অর্থাৎ, যে এই দুটি আজ্য আহুতি দেয় সে চক্ষুষ্মান অর্থাৎ উজ্জ্বল দৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

।

ভূতমেব পূর্ব আজ্যভাগঃ। ভবিষ্যদুত্তরোঽব হ বৈ ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ রুন্দ্ধেঽথো যৎকিং চ ভূতেন চ ভবিষ্যতা চ জয়্যং সর্বং হৈব তজ্জয়তি॥

শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.২.৭.১৩

অর্থাৎ, যে এই দুটি আজ্যভাগের আহুতি দেয়, তার একটি হলো ভূতকাল আরেকটি হলো ভবিষ্যৎ কাল। যে এই আহুতি প্রদান করে তার ভূত, ভবিষ্যৎ এবং ভূত-ভবিষ্যতের মাঝে অর্থাৎ বর্তমান কাল উজ্জ্বল হয়।

অর্থাৎ এই মন্ত্রের মাধ্যমে আহুতি দান ও শ্রবণ-মনন করার মাধ্যমে আমাদের পূর্বে করা পাপের স্বভাবকে ত্যাগ করার অনুপ্রেরণা লাভ করি। যে এই দুটি আহুতি দান করে তার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। যজ্ঞের নিয়মতান্ত্রিকতা তাকে একনিষ্ঠ করে তোলে। ফলে আমাদের বর্তমান উজ্জ্বল হয় যা আমাদের ভবিষ্যতকেও সমৃদ্ধ করে। যে যজ্ঞ কর্তা যজ্ঞ করে সে তার পূর্বের ত্রুটি ভুলে যায় ও মানুষও তার পূর্বের ভুল বিস্মৃত হয়ে বর্তমানের যশোগান করে, আর বর্তমানে এই যজ্ঞ পুণ্যকর্ম করার মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ কালও সুন্দর ও সুশীল হয়।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বৈদিক নিয়মে বিবাহ সংস্কার- কী? কেন? কীভাবে?

বিবাহ সংস্কার আমাদের ১৬ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হ্যস্থ আশ্রমের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে এই বিবাহ সংস্কার। তাই অন্যান্য সংস্কারের তুলনায় এই সংস্কারের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য একটু যেন বেশিই। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বেদের প্রচার ও প্রসারের ফলে সনাতনীরা বৈদিক বিবাহ সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ বিধিকে বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী পালন করছেন ও অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আবার অনেকের মনেই জিজ্ঞাসা, বৈদিক বিবাহ আবার কী? এখানে কী কী হয়? তাই এই বিষয়ে একটি সবিস্তর ধারণা থাকা আবশ্যক। আর সেজন্যেই আপনাদের জন্যই আজকের বিশেষ আয়োজন- বৈদিক বিবাহ কী? কেন? এবং কীভাবে?

🟡 বৈদিক বিবাহ কী?

বিবাহ সংস্কার আদিতে বৈদিক বিবাহই ছিলো। বর্তমান সময়ে প্রচলিত বিবাহ সংস্কারে বৈদিক শাস্ত্রাদির বিধির চেয়ে পৌরাণিক বেদবিরুদ্ধ আচার ও লোকাচারেরই আধিক্য প্রাধান্য পেয়েছে। এটির থেকে বৈদিক বিধি সম্বলিত বিবাহকে পৃথক করার জন্যেই বৈদিক বিবাহ সংস্কার শব্দটির প্রচলন। এটি আমাদের সাধারণ জীবনে যেমন বিবাহ বলে জানি ঠিক সেটাই তবে একদম বৈদিক শাস্ত্র সমর্থিত যেটি বর্তমান সময়ে দেখা যায় না।

🟡 বৈদিক বিবাহ কেন?

সনাতন বৈদিক ধর্মের মূল উৎস বেদ । 'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ' অর্থাৎ সর্বজ্ঞানময়ত্ব বেদের বেদত্ব । বেদ ঈশ্বরীয় শাশ্বত কল্যাণকারিণী বাণী । পরম পিতা পরমাত্মা অনাদি কাল হতে বারংবার - সগৌরবে জীব মাত্রের কল্যাণের নিমিত্তেই ঋষিদের শুদ্ধন্তঃকরণে বেদজ্ঞান প্রকাশিত করেন । সনাতন আইনশাস্ত্র তথা মানবজাতির প্রধান ধর্ম গ্রন্থ বেদ । কয়েকশতক আগেও বেদ শব্দটি ছিল প্রতিটি সনাতনিদের প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত । কিন্তু সময়ের বিবর্তনে,অজ্ঞানতা ও তার কলাগ্রাসে ঔপনিবেশিকদের চক্রান্তে, তথাকথিত বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত ধর্মপ্রচারক তথা স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আজ মহান বেদের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছি । ফলস্বরূপ আমরা আজ জাতি হিসেবে এক ক্রান্তিলগ্নে দাড়িয়ে । জ্ঞানের অভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে অপমানের স্বীকার তো হতেহচ্ছে বটেই, এবং নিজেদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনেও অজ্ঞতার গ্লানিবয়ে নিয়ে চলতে হচ্ছে নিরন্তর । বেদ সকল যুগ ও কালের জন্য প্রযোজ্য । এর বাণী কখনো অপ্রাসঙ্গিক হয়না,অচল হয়না । মানবজীবনে প্রয়োজনীয় সকল সংস্কার বেদেই উল্লেখ হয়েছে। তাই বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ীই আমাদের বিবাহ সহ সকল সংস্কারাদি কর্ম পালন করা উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায় (কর্মযোগ) এর ১৬ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে—

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

অর্থ:এইভাবে (যজ্ঞচক্র) প্রবর্তিত শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যে ব্যক্তি কর্ম করে না, সে পাপাচরণ করে এবং তার জীবন বৃথা যায়। সে কেবল ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়ে জীবন যাপন করে এবং প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকে না।

এই শ্লোকের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত কর্ম পরিত্যাগ করে, তারা ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন হয়ে নিষ্ফল জীবনযাপন করে। তাই গীতার উপদেশ অনুসারে, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ পথ। বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ীই আমাদের সকল সংস্কারাদি কর্ম পালন করা শাস্ত্রেরই নির্দেশ।

🟡 বৈদিক বিবাহ কীভাবে?

এক্ষণে জানলাম বৈদিক বিবাহ কী এবং কেন। এবার জানবো বৈদিক বিবাহের বিধিগুলো কী কী এবং সেগুলোর পরিচয়। উল্লেখ্য এখানের প্রতিটি বিধি গুরুত্বপূর্ণ, মাহাত্ম্যপূর্ণ্য ও অর্থবহ। এগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক আর্টিকেলে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই এখানে পরিচিতি হেতু অল্প বাক্যে লেখা হলো।

■বিবাহ লগ্নঃ লগ্ন বা বিশেষ শুভ মুহূর্ত বলতে বৈদিক বিবাহে কিছু নেই। যজমানের সুবিধানুযায়ী দিনই তার জন্য শুভদিন। বিবাহের সর্বোত্তম সময় বিকেল থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত হবে। অর্থাৎ বিবাহের পূর্ববিধি শুরু হবে বিকালে, উত্তরবিধি শুরু হবে সন্ধ্যার পর।

বৈদিক বিবাহের মূল বিধিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। পূর্ববিধি

২। উত্তরবিধি

এই দুই বিধি বাদেও বিবাহোত্তর কিছু বিধি রয়েছে যেগুলো পালন করাও বিবাহের অংশ।

🌕 পূর্ববিধি: বিবাহের মূল কাজ এখান থেকেই আরম্ভ। এখানে উল্লেখযোগ্য বিধির মধ্যে রয়েছে-

🔶মঙ্গলস্নান: বর ও কনে মঙ্গলস্নান করবে।

🔶মণ্ডপবিধি: স্নান করার পর সামান্য যজ্ঞ পূর্বক সুশোভিত বস্ত্রে কন্যা ও বর সজ্জিত হবে। ঈশ্বর স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা মন্ত্র, স্বস্তিবাচন এবং শান্তিপাঠ উভয়ই করবে এবং পাঠ শেষে বর কনের গৃহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিবে।

🔶মালাবদল: বর-কনে একজন আরেকজনকে মালা পরাবে।

🔶মধুপর্কাদি বিধি: মধুপর্ক (মধু, ঘি এবং দই দ্বারা তৈরি বিশেষ খাদ্যবিশেষ) দ্বারা বরকে আপ্যায়ন করবে। এই অংশে মুখমণ্ডল ও পা ধোয়া এবং আচমন অনুষ্ঠিত হবে।

🔶গোদান বিধি: এই বিধি মোতাবেক বরকে গোদানাদি দ্রব্য অপর্ণ করবে।

🔶পাণিগ্রহণ বিধি: কন্যার অভিভাবক কন্যার উত্তরদায়িত্ব অর্থাৎ ভরণপোষণ আদি সকল দায়িত্ব বরের হাতে অর্পণ করবে। কন্যার পাণি (হাত) বরের পাণিতে (হাতে) সমর্পণ করাই হলো পাণিগ্রহণ বিধি।

🔶প্রধান যজ্ঞ: মধুপর্কাদি বিধি সম্পন্ন হওয়ার পর যজ্ঞ আরম্ভ হবে। সাধারণ অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় যজ্ঞ শুরু হয়ে বিবাহ হেতু বিশেষ মন্ত্রে আহুতি দিবে।

🔶প্রতিজ্ঞা: বর ও কন্যা একে অপরকে ৬টি প্রতিজ্ঞা করবে।

🔶মঙ্গল প্রদক্ষিণা: প্রতিজ্ঞা করার পর বর-বধু যজ্ঞাগ্নিকে সাক্ষী রেখে ৪ বার যজ্ঞকুণ্ডের প্রদক্ষিণ করবে।

🔶শিলারোহণ বিধি: মাতা বা ভ্রাতা কর্তৃক কন্যার পা শিলার উপর রেখে এই বিধি সম্পন্ন করবে। এর অভিপ্রায় এমন যে সাংসারিক জীবনে কঠিন সময়েও যেন বধু ধৈর্য্যহারা না হয়, শিলার ন্যায় শক্ত হয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে পারে।

🔶লাজাহোম বিধি: খৈ আদি দ্রব্যের আহুতি এই ধাপে সম্পন্ন হবে।

🔶বেণিমোচন/কেশবিমোচন বিধি: একান্ত স্থানে গিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বর বধুর কেশ বিমোচন করবে।

🔶গ্রন্ধিবন্ধন: এখানে বর ও কনের পোশাক বা উত্তরীয় একে অপরের সঙ্গে গাঁথা বা বেঁধে দেওয়া হয়। এটি তাদের অটুট সম্পর্ক, পারস্পরিক বন্ধন ও দায়বদ্ধতার প্রতীক।

🔶সপ্তপদী: বিবাহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান অঙ্গ এই সপ্তপদী বিধি। এই বিধিতে বর ও বধু ঈশান কোণে সাতটি পদক্ষেপ (পদ) গ্রহণ করেন। প্রতিটি পদক্ষেপ একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা বা শপথের প্রতীক, যা তাদের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরে।

- প্রথম পদ: খাদ্য ও জীবিকা অর্জনে একসঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি।
- দ্বিতীয় পদ: শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা।
- তৃতীয় পদ: সম্পদ ও উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি।

- চতুর্থ পদ: সুখ ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি।
- পঞ্চম পদ: সন্তানদের কল্যাণ ও সুখ নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা।
- ষষ্ঠ পদ: একসঙ্গে স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় জীবনযাপন করার প্রতিজ্ঞা।
- সপ্তম পদ: সারাজীবন পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও সৎ থাকার শপথ।

🔶জলাভিষেচন: জল দ্বারা বর ও কন্যার মস্তকে জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ প্রদান করবে।

🔶সূর্যাবলোকন: বর-কন্যা একত্রে সূর্য দর্শন করবে।

হৃদয়স্পর্শ: বর ও বধু একে অপরের হৃদয় স্পর্শ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে যেন একজনের হৃদয় সর্বদা অপরজনের অনুকূলে থাকে।

🔶সিঁদুরদান ও আশীর্বাদ: এই ধাপে এসে সিঁদুরদান বা মঙ্গলসূত্র ধারণ পূর্বক বর কনেকে আশীর্বাদ করবে। এরই মাধ্যমে পূর্ববিধি সমাপ্ত। এবার বর ও কনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে এবং উত্তরবিধির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

🌕 উত্তরবিধি: বিশ্রাম সম্পন্ন হলে উত্তরবিধি শুরু করবে। এখানের উল্লেখযোগ্য বিধিগুলোর মধ্যে রয়েছে-

🔶প্রধান হোম: উত্তরবিধির প্রধান যজ্ঞ শুরু যেখানে আজ্যাহুতি প্রদান করা হয়।

🔶ধ্রুব ও অরুন্ধতী দর্শন: বর কনে-কে আকাশে স্থিত ধ্রুব ও অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাবে।

🔶স্থালীপাকাদি মঙ্গল আহুতি: বর-কনে স্থালীপাক ও মঙ্গলাষ্টাজ্যাহুতি প্রদান করবে।

🔶সহভোজন: যজ্ঞে আহুতিকৃত স্থালীপাকের অবশিষ্টাংশ বর ও কনে আহার করবে।

🔶পূর্ণাহুতি ও মহাবামদেব্যগান: অতঃপর পূর্ণাহুতি প্রদান করে মহাবামদেব্য গানের মাধ্যমে উত্তরবিধি সমাপ্ত হবে।

পূর্ববিধি ও উত্তরবিধির মাধ্যমে বিবাহের মূল পর্ব সমাপ্ত। এবার বিবাহোত্তর নিম্নের কাজগুলো করাবে:

🔶পুরোহিত, বর-বধু ও আগত অতিথিবৃন্দের আপ্যায়ন: পুরোহিত ও আগত সকল অতিথিদের যথাযথ উত্তম আহার করাবে। বর ও কনে ক্ষার-লবণ রহিত মিষ্টি-দুগ্ধাদি খাদ্যদ্রব্য ঘৃতেরসহিত ভোজন করবে।

🔶তিন রাত্রি ব্রহ্মচর্য পালন ও গর্ভাধান সংস্কার: বর-বধূ ৩ রাত ব্রহ্মচর্য পালন করবে ও পৃথক শয়ন করবে। ৪র্থ দিনে গর্ভাধান সংস্কার করবে। যদি গর্ভাধান সম্ভব না হয় তবে অন্য দিন ও সময়ে এই সংস্কার পালন করবে।

🔶কন্যার বিদায় ও বরের গৃহে গমন: মন্ত্রাদি পাঠ করে বর-কনে যাত্রার জন্য বিদায় নিবে।

🔶পতিগৃহে বধূর স্বাগত ও সামান্য যজ্ঞ: বধূর মঙ্গল প্রবেশ, স্বাগত ও আশীর্বাদ প্রদান করবে। তারপর সামান্য যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করবে।

🔶আশীর্বাদ ও স্বস্তিবাচনাদি পাঠ: বর-বধূকে আশীর্বাদ প্রদান করে স্বস্তিবাচন আদি পাঠ করবে।

🔶পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান ও অতিথিবৃন্দের সৎকার: পুরোহিতকে যথাযথ দক্ষিণা প্রদান করবে এবং অতিথিবৃন্দের উত্তম সৎকার করবে।

🔶গর্ভাধান সংস্কার: যদি ৩ রাত্রি ব্রহ্মচর্য পালনের পর গর্ভাধান সংস্কার না হয়ে থাকে তবে এই ধাপে এসে গর্ভাধান সংস্কার করবে।

এরই মাধ্যমে বৈদিক বিবাহের সকল কার্য সমাপ্ত।

বিবাহের এই বিধিগুলো শুধু দুই ব্যক্তির মধ্যে নয়, বরং দুটি পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র বন্ধনের প্রতীক। বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ প্রচলিত বিবাহের ন্যায় কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য, দায়িত্ব, মাহাত্ম্য তথা বৈদিক ভাবগাম্ভীর্যের প্রকাশের মাধ্যমে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। বৈদিক শাস্ত্রের মাহাত্ম্য জেনে বিবাহের বিধিগুলো সম্পন্ন করলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সংসার জীবনে যশ, শ্রী, সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য, মঙ্গল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

তাহলে আর দেরী কীসের? আপনার জীবনের বিশেষ দিনটি কেবল আনুষ্ঠিকতার মাধ্যমে সম্পন্ন না করে বৈদিক ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বৈদিক নিয়মে সম্পন্ন করে এই সংস্কারটি অর্থবহ করুন।

আজ তবে এতটুকুই, বাকি কথা হবে বিবাহের মণ্ডপে। নমস্কার।

(বৈদিক বিবাহ সংস্কারসহ ষোড়শ সংস্কারাদি কর্ম, শান্তিযজ্ঞ, জন্মদিন, বাগদান, বিবাহবার্ষিকী, আয়ুষ্কাম যজ্ঞ আদি বৈদিক নিয়মে সনাতনী বিশেষ পর্বগুলো পালন করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।)

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

যজ্ঞেই সনাতন ধর্ম অবস্থিত - যজ্ঞ করেন তো ?

দর্শং চ পৌর্ণমাসং চ অগ্নিহোত্রং চ ধীমতঃ।

চাতুর্মাস্যানি চৈবাসংস্তেষু ধর্মঃ সনাতনঃ॥

মহাভারত শান্তিপর্ব ২৬৯.২০

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান মানুষের জন্য দর্শ=অমাবস্যাতে যজ্ঞ, পৌর্ণমাস=পূর্ণিমাতে যজ্ঞ, দৈনিক অগ্নিহোত্র ও চাতুর্মাস্য পালনের বিধান রয়েছে, কেননা তাতেই সনাতন ধর্ম স্থিত।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

রান্না করা কি কেবল মেয়েদের শেখার বিষয় ?

যুগশ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যকার মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন, নারী-পুরুষ উভয়েরই উচিত রান্না শেখা ~

কুমারাঃ পুরুষশালাং কুমার্য্যশ্চ স্ত্রীশালাং গত্বা ব্রহ্মচর্য্যং বিধায় সুশীলতয়া বিদ্যাঃ পাকবিধিং চ গৃহ্নীয়ুঃ। আহারবিহারানপি সুনিয়মেন সেবয়েয়ুঃ।

যজুর্বেদ ১১.৫৯ ঋষিভাবার্থ

অর্থাৎ, বালকেরা পুরুষদের এবং বালিকারা মেয়েদের পাঠশালায় যেয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে বিধিপূর্বক সুশীলতার সাথে বিদ্যা ও ভোজন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শিখবে এবং আহার বিহারও নিয়মানুসারে শিখবে।

বাবা-মাকে ত্যাগ করে আমার শিষ্য হয়ো না - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

মহর্ষি দয়ানন্দের রাজনাথ এক শিষ্য ছিলো। সে মহর্ষির জন্য রান্না করতো। একদিন রাজনাথ যখন রান্না করছিলো মহর্ষি বলে উঠলেন, 'তোমার বাবা আসছেন, তোমাকে আমি বলেছিলাম বাবার অনুমতি নিয়ে এসো কিন্তু তা করোনি, তিনি কষ্ট পেয়েছেন'। রাজনাথ চমকে উঠলো, বাইরে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলোনা। আধা ঘণ্টা পরে তার বাবা সত্যিই চলে এলো এবং রাজনাথকে দেখে কান্না করতে লাগলো। মহর্ষি এসব দেখে কষ্ট পেলেন আর রাজনাথের বাবাকে বললেন, 'তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাও। আমি অন্য সাধুদের মতো নই যে তোমার সন্তানকে শিষ্য করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে তোমাকে কষ্ট দেবো'।

- মহর্ষি দয়ানন্দ জীবন চরিত [ঘাসীরাম, পৃ০ ২১৬]

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

পণ্ডিত লেখরামের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধর্মবীরো লেখরামঃ (এপ্রিল,১৮৫৮ - ৬ই মার্চ, ১৮৯৭খ্রি.)

বৈদোদিতো ধর্মং ইহাস্ত্যভীষ্টঃ,
লোকস্য সর্বস্য হিতায় নূনম্ ।
তস্য প্রচারে সততং প্রসক্তঃ,
শ্রী লেখরামো মহনীয় আসীৎ ॥১॥

সমগ্র সংসারের কল্যাণের জন্য বেদে নিশ্চিত ধর্মই দরকার - এটি বুঝে বেদ-ধর্ম প্রচারের জন্য নিরন্তর কাজ করা শ্রী লেখরাম মহান হয়ে আছেন।

অভ্যস্য ভাষাং যবনাদিকানাম্,
অধীত্য তেষাং মতপুস্তকানি ।
সত্যং বিভীকঃ প্রথয়ন্ যথার্থং,
শ্রী লেখরামো মহনীয় আসীৎ ॥২॥

যবনাদি ভাষা শিখে ও তাদের বইপত্র পড়ে নির্ভীকিভাবে যিনি যথাযথ সত্য প্রচার করতেন এমন শ্রী লেখরাম মহান।

ছলস্য নামাপি বিবেদ নাসৌ,
ভোতের্লবোঽপ্যাস ন তস্য চিত্তে।
পাখণ্ডমুগ্রং খলু খণ্ডয়ন্ সঃ,
শ্রী লেখরামো মহনীয় আসীৎ ॥৩॥

তিনি ছল কাকে বলে তাও জানতেন না, মনে বিন্দুমাত্র ভয় ছিলো না, তীব্রভাবে পাষণ্ড খণ্ডন করেছেন, এমন শ্রী লেখরাম মহান।

লিলেখ লেখান্ স যথার্থনামা,

তর্কস্য তর্কুং সততং দধানঃ।

চরন্ বিশঙ্কো নর-কেসরীব,

শ্রী লেখরামো মহনীয় আসীৎ ॥৪॥

যিনি নিজের নাম সার্থক করে তর্করূপী ছুরির মাধ্যমে ক্রমাগত লিখেছেন, নরসিংহের মতো নির্ভীক হয়ে বিচরণকারী সেই শ্রী লেখরাম মহান ।

চচার ভূমাবভয়ঃ সুধীরঃ,

সুখং ন দুঃখং গণয়ন্ ন চাভূৎ।

ধর্মপ্রচারং বিদধচ্ছমেণ,

শ্রী লেখরামো মহনীয় আসীৎ ॥৫॥

ভারতভূমিতে যিনি নির্ভীকভাবে সুখ-দুঃখের পরোয়া না করে ঘুরেছেন, ধৈর্যপূর্বক কষ্ট সহ্য করেছেন, পরিশ্রম করে ধর্ম প্রচারকারী সেই পণ্ডিত লেখরাম মহান।

ব্যাপাদিতো লবপুরে ছুরিকাপ্রহারৈ-

ধূর্তেন কেনচিদহো যবনেন যূনা।

প্রাপ্তোঽমরত্বপদবীং বলিদানতোঽসৌ,

শ্রী লেখরামবিবুধো মহনীয় আসীৎ ॥৬॥

কিন্তু হায় ! দুঃখ এটাই, লাহোরে তাঁকে এক ধূর্ত মতান্ধ অহিন্দু যুবক ছু রি কা ঘা তে হ ত্যা করে। নিজের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অমর বিদ্বান শ্রী লেখরাম মহান হয়ে আছেন।

পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড

অনুবাদ: বাংলাদেশ অগ্নিবীর ঢাকা বিভাগীয় শাখা

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

'রাষ্ট্রপতি' শব্দটি মহাভারতের সময় থেকেই প্রচলিত

মহাভারতের বনপর্বে দ্বৈতবন পরিভ্রমণে শ্রী যুধিষ্ঠির ও রামোপাখ্যানে শ্রীরামচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে

তপাত্যয়ে পুষ্পধরৈরুপেতং মহাবনং রাষ্ট্রপতির্দদর্শ॥

মহান্তি যূথানি মহাদ্বিপানাং তস্মিন্বনে রাষ্ট্রপতির্দদর্শ॥২৪.১৭,১৯

অযোধ্যাং স সমাসাদ্য পুরীং রাষ্ট্রপতিস্ততঃ॥২৯১.৬০

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বিকর্ণ

©আর্যতীর্থ

যাজ্ঞসেনীর খুলছে শাড়ি , টানছে ধরে দুঃশাসন,
দায় ছিলো যার গর্জে ওঠার, নিচু মাথায় সে পাঁচজন।
দুর্যোধনের নগ্ন উরু, ইঙ্গিতে তার ধর্ষকাম,
হস্তিনাপুর দেখছে বসে, ধ্বস্ত হতে তার সুনাম।
অন্ধরাজা সিংহাসনে, আর্ত চেঁচান বৌমা তার,
নিজের দলের নির্যাতনে, সব রাজা হন নির্বিকার।
কর্ণ বসে হাসছে হা হা, রাজার দলের লোক তো সে
শর্তবিহীন সমর্থনেই , তাবত আরামসুখ বশে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ নীরব, সরকারী লোক হাজার হোক
রাজার কথাই তোমার কথা, তুমি যখন রাজার লোক।
খল শকুনি দেখছে সবই, বস্তুত সে ধ্বংস চায়,
ঘরের মাটি লাল হয়ে যাক, দেশবিভাগের যন্ত্রণায়।
সুশীল সভায় ঘটছে যখন, রাজঅপরাধ জঘন্য,
ঠিক তখনই তার বিরোধে, চেঁচিয়ে ওঠেন বিকর্ণ।
বিকর্ণ নন কেউকেটা লোক, একশো ভাইয়ের একজনা
তেমন করে এর আগে কেউ, তার কথাটাই জানতো না।
জতুগৃহে কাড়েননি রা, অন্তত তা নেই লেখা,
ভীমকে যখন বিষ খাওয়ালো, তখনও তাঁর নেই দেখা।
কিন্তু যখন প্রকাশ্যতেই কাড়ছে নারীর আব্রু কেউ,
স্তব্ধ জিভের চুপসাগরে, বিকর্ণ হন একলা ঢেউ।
চেঁচিয়ে ওঠেন রাজার কুমার, যুবরাজের বিরুদ্ধেই,
মহাবলী পান্ডবেরও, তখন গলায় সে সুর নেই।
রাজাও যখন নীরব থেকে, সায় দিয়ে যায় ধর্ষণে,
ঠিক তখনই সমস্ত যুগ, বিকর্ণদের স্বর শোনে।
আমরা যারা কিচ্ছুটি নই ,একটি মোটে ভোট কেবল,
অত্যাচারের সামনে এলে, সঙ্গী শুধু চোখের জল
পোষ্যভাবে জাবনা চেবাই, অন্ধ এবং নি-কর্ণ,
প্রার্থনা থাক আমরা যেন, একবার হই বিকর্ণ।
মরার আগে হতেই হবে, রাজার সভায় বিকর্ণ।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সাংখ্য দর্শনের ১।৯২ সূত্রে কি ঈশ্বরের অনস্তিত্বতা প্রতিপাদন করা হয়েছে?

মহর্ষি কপিল সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্বানগণের এই ধারণা আছে যে তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। এই মতের সমর্থনে শীর্ষস্থ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্র উপস্থাপন করা হয়। কপিল-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে এমন আরও অনেক প্রসঙ্গ ও সূত্র আছে, যা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সিদ্ধির জন্য সুপুষ্ট প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যেতে পারে, কিন্তু এগুলো খুঁজে দেখার বা বিচার করার কষ্টের জন্য কেউ প্রস্তুত নন। এর বিপরীতে শীর্ষস্থ সূত্র এমন বিশেষ স্থান প্রাপ্ত করেছে যে, এই বিষয়ে সামান্য আগ্রহী ব্যক্তিও এই সূত্র সম্পর্কে পরিচিত এবং প্রসঙ্গ আসলে পদে পদে কপিলের নিরীশ্বরবাদীতাকে স্পষ্ট প্রমাণ করার জন্য এই সূত্র উদ্ধৃত করেন। সূত্রটি কোন প্রসঙ্গে এসেছে, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়েই এই সূত্রের স্পষ্ট ও সহজ শব্দগুলো দেখে বলপূর্বক বলে দেন যে, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব আছে, তা সিদ্ধ করা যায় না।

ব্যাখ্যাতা ভাষ্যকারগণ নিজের ভাবনা ও ধারণা অনুসারে এই সূত্রের ব্যাখ্যা অনেকভাবে করেছেন। কিছু ব্যাখ্যাকার একে পূর্বপক্ষ সূত্র মেনে উত্তরপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে সন্তোষ লাভ করেছেন, আর কেউ উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তসূত্র মেনে একে নিছক জটিল তর্ক বলেছেন। কারো এরূপ বিচার যে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, তাঁকে বাদ দিয়েও সৃষ্টিক্রমের ব্যাখ্যা করা যায়—এই সূত্রে কপিলের বলার তাৎপর্য এটুকুই। ফলে একথা বলা যাবে না যে, কপিলের ঈশ্বর বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল বা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে সরাসরি এই সূত্রের প্রয়োগ করেন।

গভীরভাবে এই বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা আছে যে, এই সমস্ত ভাবনার মধ্যে কপিলের নিজের মতামত কী ছিল এবং তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের কাছে কী কী উপায় আছে? যা আছে, তা নিঃসঙ্কোচে প্রয়োগ করা উচিত। প্রথমে সেই প্রসঙ্গে বিচার প্রস্তুত করা যাক, যেখানে কপিল এই সূত্রটির নির্দেশ করেছেন।

সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ ও পরীক্ষার প্রসঙ্গে কপিল এই সূত্রের উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে সেই প্রকরণের প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলো শুধুমাত্র আমাদের উপলব্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা করব; অন্য ভাষ্যকারদের মতের খণ্ডন, মণ্ডন বা সমর্থন করব না। যিনি এই বিষয়ে আগ্রহী, তিনি স্বয়ং এর জন্য কষ্ট স্বীকার করুন। প্রত্যক্ষ লক্ষণের সূত্র—

যৎসম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। (সাংখ্য দর্শন ১।৮৯)

যার সাথে সম্বদ্ধ হয়, সেই আকারের ধারণকারী বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে।

চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়াকার হয়ে ওঠে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে 'বুদ্ধিবৃত্তি' বলা হয়। সূত্রে এই বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই 'বিজ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। বিজ্ঞান বা এই বুদ্ধিবৃত্তিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। সূত্রকার এখানে বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রমাণ বলে স্পষ্ট করেছেন যে, পুরুষের

যে যে বোধ হয়, তা প্রমা অর্থাৎ প্রমাণের ফল। বুদ্ধিবৃত্তি সেই বিষয়কে পুরুষের জন্য অর্পন করে, পুরুষ তার দ্বারা সুখ-দুঃখ আদির অনুভব করে। এটিই পুরুষের ভোগ।

আত্মার বিবিধ সুখ-দুঃখ আদির ভোগ দ্বারা এটি বোঝা উচিত নয় যে, আত্মার মধ্যে কোনো প্রকার বিকার বা পরিণামের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিণাম অচেতন পদার্থের ধর্ম, চেতন আত্মা সদা অপরিণামী। তবুও চেতন স্বভাবের কারণে আত্মা সুখ-দুঃখাদির অনুভব করে এবং বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত করে। আত্মার এই অনুভব বা জ্ঞানকেই 'প্রমা' বলা হয়; এজন্যই এর সর্বোৎকৃষ্ট সাধন বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ লক্ষণের পরীক্ষার ভাবনা থেকে শিষ্য উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে দোষ উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন— যোগীদের অতীত, অনাগত তথা দূরবর্তী বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা শাস্ত্র ও ব্যবহার-সিদ্ধ। কিন্তু অতীতাদি অবস্থায় চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধির বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়, কারণ অতীত বা অনাগত হওয়ার কারণে বাহ্য বিষয়টির তখন অস্তিত্বই থাকে না, অথবা তা ব্যবস্থিত থাকে। এই অবস্থায় যোগীদের প্রত্যক্ষ স্থলে এই লক্ষণ ঘটিত হয় না এবং এইভাবে উক্ত লক্ষণে 'অব্যাপ্তি' দোষ উপস্থিত হয়।

সূত্রকার প্রথমেই শিষ্যের এই আশঙ্কার সমাধান করে বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে করেছি, যোগীদের যোগজ ধর্ম দ্বারা যে প্রত্যক্ষ হয়, সেই দৃষ্টিতে নয়। সূত্রটি এই—

যোগিনামবাহ্য প্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ। (সাংখ্য দর্শন ১।৯০)

যোগীদের প্রত্যক্ষ, বাহ্য প্রত্যক্ষ না হওয়ায় কোনো দোষ হয় না।

প্রত্যক্ষ দুই প্রকার—বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অবাহ্য প্রত্যক্ষ। বাহ্য বিষয়ের বিদ্যমানতায় সর্বসাধারণের যে প্রত্যক্ষ হয়, সেটি বাহ্য প্রত্যক্ষ। এতে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধি, বাহ্য বিষয়ের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রস্তুত সূত্রে এরূপ প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ কথিত হয়েছে। যোগীদের হওয়া প্রত্যক্ষে তো বাহ্য বিষয়ের সাথে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না। এজন্য যোগীদের প্রত্যক্ষে যদি প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণ ঘটিত না হয়, তবে এতে কোনো দোষ হয় না।

শিষ্য প্রত্যক্ষের লক্ষণে যে 'অব্যাপ্তি' দোষ উত্থাপন করেছিলেন, তার দুটি সমাধান সূত্রকার করেছেন। প্রথম সমাধানে 'অব্যাপ্তি' স্থলকে প্রত্যক্ষ লক্ষণের সীমা থেকে বের করেছেন। শিষ্য যোগীর প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি দোষ উপস্থিত করেন, কারণ সেই প্রত্যক্ষ তো মান্য, কিন্তু প্রত্যক্ষের লক্ষণের সাথে সেটির সমন্বয় হচ্ছে না। যোগীর প্রত্যক্ষে বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে বুদ্ধি, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিজের সম্পর্ক স্থাপন করেন না, কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রস্তুত লক্ষণে এটি বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এই স্থিতিতে সূত্রকার বলেছেন যে, এই লক্ষণ যোগীর প্রত্যক্ষের জন্য বলা হয়নি। এইভাবে যোগীর প্রত্যক্ষকে প্রস্তুত প্রত্যক্ষ লক্ষণের সীমা থেকে বের করেছেন। উত্থাপিত অব্যাপ্তি দোষের এটি প্রথম সমাধান, যা এই সূত্র থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরবর্তী সূত্রে দ্বিতীয় সমাধান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যোগীর প্রত্যক্ষেও এই লক্ষণের সমন্বয় হয়। যোগীর প্রত্যক্ষ প্রস্তুত প্রত্যক্ষ লক্ষণের সীমার বাইরে থাকে না, তাই অব্যাপ্তি দোষের সম্ভাবনা নেই। কারণ এই যে, সাংখ্য বস্তুর উৎপত্তির বিষয়ে সৎকার্য-সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে। এর অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক কার্য তার কারণরূপে সদা বিদ্যমান থাকে, কোনো বস্তুর সম্পূর্ণ নাশ হয় না। যে কার্যকে ব্যবহারে অতীত বলা হয়, সেটি তার কারণে সেই রূপে এখনও বিদ্যমান থাকে। এভাবে অনাগত বস্তুও তার কারণে বিদ্যমান থাকে। যোগজ

শক্তির সহযোগে যোগীর বুদ্ধি কার্যমাত্রের মূলকারণের সাথে বস্তুজিজ্ঞাসা নিয়ে নিজের সংযোগ স্থাপন করে এবং সেই স্থিতিতে প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষাৎ করে। সূত্রকার এই অর্থটি নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট করেছেন—

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাঽদোষঃ। (সাংখ্য দর্শন ১।৯১)

এই সূত্রে 'লীনবস্তু' পদ মূল প্রকৃতির জন্য প্রযুক্ত হয়েছে, যেখানে সমস্ত বস্তু লীন হয়ে যায়, কার্যমাত্রের লয়ের মূলস্থান। এরূপ তত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক মূল প্রকৃতি। এখানে 'প্রকৃতি' পদের পরিবর্তে 'লীনবস্তু' পদের প্রয়োগ এজন্য করা হয়েছে যে, যাতে কার্যমাত্রের মূলকারণে লয় হওয়া সূচিত করা যায়। সূত্রার্থ হবে—

(লীনবস্তু) প্রকৃতির সাথে (লব্ধ) প্রাপ্ত (অতিশয়) যোগজ শক্তির (সম্বন্ধাৎ) সম্বন্ধ থেকে (বা) অথবা (অদোষঃ) প্রত্যক্ষ লক্ষণে অব্যাপ্তি আদি কোনো দোষ হয় না। [লীনবস্তুনা-প্রধানেন মূলকারণেন সহ লব্ধোঽতিশ যেন-যোগশক্ত্যতিশয়দ্বারা য়ঃ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে নাব্যাপ্তিদোষ ইত্যর্থঃ]।

যোগী অতীত ও অনাগত বস্তু প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছায় যোগজ শক্তির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে মূল প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কার্যমাত্রের মূল উপাদান হওয়ায় কারণাত্মতা সমস্ত কার্য এতে উপস্থিত থাকে। যা সর্বসাধারণের জন্য সর্বথা অদৃশ্য বস্তু, যোগী যোগজ শক্তির দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষ করে নেন। যোগী প্রকৃতিতে যে কার্যকে প্রত্যক্ষ করতে চান, তার বুদ্ধি তদাকার হয়ে ওঠে। এইভাবে যোগীর অতীত অনাগতের প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ থাকে না। সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ও যোগীর প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়ের সাথে বুদ্ধির সম্বন্ধ চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যোগজ শক্তির দ্বারা হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই বুদ্ধির বিষয়াকার হওয়া একই, যা প্রত্যক্ষের স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গ থেকে জগতের মূল উপাদান তত্ত্ব রূপে প্রকৃতির নির্দেশ হওয়ার পর এর দৃঢ়তা নিয়ে শিষ্য পুনরায় আশঙ্কা করেন। তিনি বলেন যে, বৈদিক সাহিত্য তথা উপনিষদ আদির অনেক স্থানে এরূপ সংকেত পাওয়া যায়, যার আধারে চেতন ঈশ্বরকেই জগতের উপাদান কারণ মানা উচিত; আবার অতিরিক্ত প্রকৃতিকে উপাদান মানার আবশ্যকতা থাকে না। এই আশঙ্কার সমাধান সূত্রকার করেছেন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। (সাংখ্য দর্শন ১।৯২)

যে ঈশ্বরের কথা তুমি বলেছ, তাকে সিদ্ধ করা যায় না। ঈশ্বর যে নেই, এই অর্থ এই সূত্রের হতে পারে না। কারণ ৯৬ ও ৯৯ সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ, এবং প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই এই স্থানে বিচার আরম্ভ হয়েছে। যদি অনীশ্বরবাদীতাই সূত্রের অভিপ্রেত হত, তবে ৯৬ ও ৯৯ সূত্রে পুনরায় ঈশ্বর সিদ্ধ স্বীকার করার কোনো কারণ দৃষ্ট হয় না। একবার ঈশ্বরের প্রমাণ নেই বলে পুনরায় তা স্বীকার করার কোনো কারণ সূত্রকার অবশ্যই প্রদর্শন করতেন। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, জগতের উপাদানভূত ঈশ্বর কোনো প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। যেকোনো বস্তুকে তিন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করা যায়। জগতের উপাদানভূত ঈশ্বরকে কোনো প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। এরূপ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব নয়, কারণ কোনো অবস্থাতেই আমরা ঈশ্বরকে জগতরূপে পরিণত হতে দেখি না। অনুমানও সম্ভব নয়, কারণ—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। (সাংখ্য দর্শন ১।৯৩)

যেকোনো চেতন-এর অস্তিত্বের দুটি অবস্থা স্বীকৃত—মুক্ত অথবা বদ্ধ। যদি ঈশ্বর মুক্ত হন, তবে জগৎ তাঁর পরিণাম কীভাবে হবে? কারণ সেক্ষেত্রে ঈশ্বর পরিণামী হয়ে পড়বেন, তিনি মুক্ত থাকতে পারবেন না। যদি

ঈশ্বরকে বদ্ধ মানা যায়, তো ধর্ম অধর্ম আদির সাথে সম্বন্ধ হওয়ার কারণে তিনি ঈশ্বর কীভাবে থাকবেন? এইভাবে কোনো অবস্থাতেই জগতের উপাদান কারণভূত ঈশ্বর অনুমান দ্বারা সিদ্ধ নন। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ মানলে তাঁকে বদ্ধ বা মুক্ত—কোন অবস্থায় সম্ভব হবে?

শিষ্য পুনরায় আশঙ্কা করেন, বদ্ধ বা মুক্ত অবস্থা যা-ই হোক, কার্য থেকে কারণের অনুমান তো সম্ভব। সূত্রাকার পরবর্তী সূত্রে এর সমাধান করেছেন—

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। (সাংখ্য দর্শন ১।৯৪)

ঈশ্বরকে বদ্ধ বা মুক্ত যা-ই মানা হোক না কেন, তাঁকে চেতন তো মানতেই হবে। এটি স্পষ্ট সিদ্ধ যে, সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য জগৎ অচেতন। তাহলে চেতন ঈশ্বরের জগৎরূপ অচেতন পরিণাম কীভাবে হল? বস্তুতঃ যদি ঈশ্বরের অচেতন পরিণাম মানা যায়, তবে ঈশ্বরকে মুক্ত বা বদ্ধ যা-ই বল, তিনি পরিণামী অথবা বিকারী হওয়ায় থেকে রক্ষা পাবেন না। এইভাবে কার্য থেকে উপাদান কারণ অনুমান করলে ঈশ্বরকে অচেতন মানতে হবে, কিন্তু কোনো শাস্ত্র বা শ্রুতিতে এরূপ ঈশ্বরকে স্বীকার করেনি। অতএব জগতের উপাদানভূত ঈশ্বর আসিদ্ধ,—এটাই বলতে হবে। সূত্রে 'অসৎকরত্বম্' পদের অর্থ— অচেতন পরিণামিত্ব। মুক্ত বা বদ্ধ উভয় অবস্থাতেই চেতন ঈশ্বরের অচেতন পরিণাম হওয়া প্রমাণবিরুদ্ধ। এরূপ কার্য-কারণ প্রমাণ সর্বথা অমান্য।

শিষ্য পুনরায় আশঙ্কা করেন, যদি উপাদানভূত ঈশ্বরের সিদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সম্ভব না হয়, তবে শব্দ প্রমাণ তার সাধক। উপনিষদাদিতে এরূপ সংকেত উপলব্ধ, যার আধারে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ মানা উচিত। অতঃ এটি শব্দ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ; এরূপ ঈশ্বর অসিদ্ধ নন। সূত্রকার এর সমাধান দেন—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা। (সাংখ্য দর্শন ১।৯৫)

নিত্য মুক্ত আত্মা পরমাত্মাই। ঔপনিষদিক প্রসঙ্গে তাঁর প্রশংসার বর্ণনা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। এই আধারেই তাঁর উপাদানতার বর্ণনা এসেছে। অভিপ্রায় এই যে, কেবল পরমাত্মার প্রশংসার ভাবনা থেকেই এরূপ বর্ণনা এসেছে। এর অতিরিক্ত, প্রত্যেক ভগবদ্ভক্ত যখন ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই নিজের সামনে দেখতে চান, তাঁকেই সবকিছু কল্পনা করে নেন—মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, বিদ্যা, ধন ও সর্বস্ব পর্যন্ত। এই কারণে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান বলা আশ্চর্যের কিছু নয়। পরমাত্মার এই স্বরূপের উপযোগ কেবল উপাসনা আদির জন্য প্রযোজ্য, এই অর্থ বাস্তবিকতাকে প্রকট করে না। এইভাবে কেবল উপাসনা আদির জন্য পরমাত্মার স্বরূপের প্রশংসায় নির্ধারিত উপাদানতার সংকেতকারী বাক্যসমূহের সমন্বয় করা যেতে পারে।

অথবা, সূত্রের 'উপাসা' ও 'সিদ্ধস্থ'—এই দুটি পৃথক পদ। 'সিদ্ধ' পদ পরমাত্মার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। উপনিষদ আদির কতিপয় স্থলে—যেখানে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে পরমাত্মাকে জগতের উপাদান বলার সংকেত পাওয়া যায়, তা কেবল পরমাত্মার উপাসনার দৃষ্টিতেই উল্লেখ করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, এরূপ সমস্ত বর্ণনার সামঞ্জস্য পরমাত্মার প্রশংসা বা উপাসনা আদিতেই উপযুক্ত, সেই অর্থ বাস্তবিকতার আধারে নয়। ফলতঃ পরমাত্মা জগতের উপাদান কারণ—এই কথায় শব্দকেও প্রমাণ মানা যায় না। এইভাবে সমস্ত প্রমাণের আধারে ঈশ্বরের জগদুপাদানকারণতা অসিদ্ধ।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন— যদি সাংখ্যে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ না মানা হয়, তাহলে তাঁর স্থিতির কোন স্বরূপ মানা হয়েছে? সূত্রকার বলেন—

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। (সাংখ্য দর্শন ১।৯৬)

ঈশ্বরের সন্নিধান দ্বারা (প্রকৃতিতে সমস্ত প্রকারের প্রবৃত্তি হওয়ার কারণে, তিনি) অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ হন, মণির ন্যায়। জগতের মূল উপাদান অচেতন প্রকৃতিতে যেকোনো প্রবৃত্তি চেতনের অপেক্ষা বা প্রেরণা ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে হয় না। সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও সঞ্চালন আদির নিয়ন্তা এক চেতন সত্তা আছেন। যেমন অয়স্কান্ত মণি (চুম্বক) লৌহ ধাতুর সান্নিধ্যমাত্রে ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন করে, তেমনি চেতন পরমাত্মা কেবল নিজের সান্নিধ্য দ্বারা সমস্ত প্রকৃতির সঞ্চালন করেন। প্রকৃতিতে প্রতিটি ক্রিয়া বিকার বা পরিণাম চেতনের প্রেরণা দ্বারা হয়। যেমন মণির স্বাভাবিক সামর্থ্য এই যে সে লৌহ ধাতুকে বিচলিত করে, তেমনি চেতনের স্বভাব অচেতনকে প্রেরণা প্রদান করা। প্রেরণা, সংকল্প বা সান্নিধ্য চেতনের একই স্থিতির নির্দেশ করে।

মণির উদাহরণ শুধু এটুকু যে, সে নিজের এক সামর্থ্য বিশেষের কারণে অন্য ধাতু বিশেষকে সক্রিয় করতে পারে। এইভাবে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে চেতনে সান্নিধ্য নিমিত্ত কারণ; এটাই চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্বের স্বরূপ। ফলতঃ চেতন জগতের উপাদান না হয়ে অচেতন উপাদান প্রকৃতিতে প্রকৃতির নিমিত্ত কারণ হয়। সমস্ত বিশ্বের নিয়ন্তা ও অধিষ্ঠাতা, অল্পজ্ঞ তথা অল্পশক্তি আদি ন্যূনতার কারণ জীবাত্মা সম্ভব নয়, এজন্য সাংখ্যে সমস্ত প্রকৃতির নিয়ন্তা ও অধিষ্ঠাতৃরূপে এক চেতন সর্বান্তর্যামী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা ঈশ্বরের প্রতিপাদন করা হয়েছে। অধিষ্ঠাতৃ শব্দটি অধিপূর্বক স্থা ধাতু দ্বারা তৃচ্ প্রত্যয় যোগে তথা ধ্-এর স্থলে ঠ ও স্-এর স্থলে ষ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। এখানে অধি উপসর্গ সপ্তমী বিভক্তির অর্থে বিদ্যমান। এবং বিভক্তি অর্থে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রের (২।২।১৬) দ্বারা এখানে অবয়বীভাব সমাস হয়েছে, যার অর্থ হবে 'মধ্যে স্থিত'। তদনুসারে ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে স্থিত (ব্যাপক) হওয়ার কারণে তাঁকে অধিষ্ঠাতা বলা হয়েছে।

এইভাবে এটি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর—অর্থাৎ জড় জগতের মূল উপাদান ঈশ্বর নন, বরং প্রকৃতি। এজন্য সমস্ত অতীত অনাগত কার্য নিজের মূল উপাদান প্রকৃতিতে কারণরূপে বিদ্যমান থাকতে পারে; আর যোগী যোগজ শক্তি দ্বারা প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অতীত অনাগত বস্তুর প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এজন্য প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষের অবকাশ থাকে না।

সূত্রে উল্লিখিত 'তৎ' শব্দ ৯২ সূত্রের উল্লিখিত 'ঈশ্বর'বোধক, ৯৩ সূত্রে 'তৎসিদ্ধি' পদের 'তৎ' শব্দও পূর্ববর্তী ৯২ সূত্রের 'ঈশ্বর'বোধক। অতএব এই ৯৬ সূত্রের 'তৎ' শব্দ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের বোধক হতে পারে না। অতএব প্রকৃতিস্থ পুরুষকে যে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সূত্রের 'তৎ' পদবাচ্য ঈশ্বর তাঁর থেকে অতীত; নিত্য, নির্গুণ পরমাত্মা বলেই স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয়। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' সূত্রের অর্থ কখনই এরূপ হইতে পারে না যে, ঈশ্বর সিদ্ধ নন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হতে পারে না, এটিই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই বলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা সূত্রকারের অভিপ্রেত হলে, যে আপত্তির উত্তরে ৯২ সূত্র রচিত হয়েছে, সেই আপত্তির উত্তর সদুত্তর বলে কোনোপ্রকারে প্রতিপন্ন করা যায় না; এবং এরূপ অসঙ্গত উত্তর ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের শিষ্যকে উপদেশ করা কখনো সম্ভব নয়।

এই প্রকরণের ব্যাখ্যানে বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন বিচার প্রদর্শন করেছেন। এই বিভিন্নতার মুখ্যত দুটি দিক রয়েছে। এক দিক—কপিল এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মধ্যযুগের ভাষ্যকারদের প্রধান দিক এই দিকেই। এই আধারে তারা কপিলকে অনীশ্বরবাদী তথা নাস্তিক পর্যন্ত বলার সাহস দেখিয়েছেন। তবে চিন্তনীয় বিষয় এই যে, তারা কপিলের অন্তর্নিহিত ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যত্নশীল নন। কতিপয় আধুনিক বিদ্বান কপিলকে অনীশ্বরবাদী বলে থাকেন কেবল এই কারণে যে, তিনি ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ মানেন নি। কিন্তু বস্তুতঃ একটু গভীরভাবে বিচার করলে বুঝা যায় যে, বাস্তবিক অনীশ্বরবাদী তো সেই বিচারক, যিনি ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ বলেছেন। এমন বলে সেই বিদ্বান বস্তুতঃ অচেতন প্রকৃতিকেই ঈশ্বর নাম দিয়ে দেন, এবং ঈশ্বরের বাস্তবিক অস্তিত্বকে মুছে ফেলেন।

ভাষ্যকারদের দ্বিতীয় দিক এই যে— তারা এই প্রকরণে কোনোভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তারা এই সূত্রগুলোর বহুপ্রকার স্বেচ্ছাচারী অর্থ করেছেন, যাকে না সর্বাত্মনা প্রকরণে সঙ্গত বলা যায়, আর না এই ধরনের ব্যাখ্যায় সাংখ্য সিদ্ধান্তকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ সমস্ত ভাষ্যকারগণ উক্ত সূত্রের (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ) অবতরণিকা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেননি, যার ফলে তারা বাস্তবিকতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। অধিক ভাষ্যকার মনে করেছেন যে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দূর করতেই এই সূত্র উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এই অব্যাপ্তির দূর করা তো সেইভাবেও সম্ভব, যেভাবে যোগীর প্রত্যক্ষে করা হয়েছে। যোগী যোগজ শক্তি দ্বারা প্রকৃতি বা তজন্য সমস্ত অতীত অনাগত পদার্থের প্রত্যক্ষ করতে পারেন, আর পরমাত্মার এরূপ অনন্ত শক্তি স্বতঃই বর্তমান। তিনি তো সমস্ত কার্য-কারণ জগৎ ও আমাদের দৃষ্টিতে অতীত অনাগতকে পূর্ণরূপে বর্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন; তাঁর সম্বন্ধ তো প্রত্যেক পদার্থের সাথে চিরকাল স্থিত। তাহলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এছাড়াও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি অথবা সমন্বয়ের প্রশ্নের উত্তর—ঈশ্বরের অসিদ্ধি—কীভাবে হবে? এটি তো 'আম্রান্ পৃষ্টঃ কাবিদারানাচষ্টে' এর ন্যায় চরিতার্থ করে। প্রশ্ন করা হয়েছে আম সম্বন্ধে, শুরু করেছ কচনার কাহিনী।

যদি বলা যায় যে, "না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশি" অনুসারে যখন ঈশ্বরই অসিদ্ধ, তো প্রত্যক্ষ লক্ষণে অব্যাপ্তির অবকাশ থাকবে না; তখন আবার এই প্রশ্নটি উত্থাপনই করা হলো কেন? যদি ঈশ্বরের অসিদ্ধিকে প্রকাশ জন্য, তবে এই বক্তব্য সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিরোধী হবে। কারণ, ঐ প্রকরণের শেষে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতারূপে চেতনকে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়াও তৃতীয় অধ্যায়ে 'সঃ হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা' (৫৬) তথা 'ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা' (৫৭)—এই সূত্রগুলোর মাধ্যমে সমস্ত জগতের নিয়ন্তা ও অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে।

এরপর পুনরায় পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঈশ্বরকে কর্মফলপ্রদাতা বলে (২) সেই প্রকরণের শেষে জগতের প্রতি ঈশ্বরের উপাদানতার নিষেধ করে (৮) প্রকৃতির উপাদানতা প্রতিপাদন করা হয়েছে (৯,১০)। যেসব ভাষ্যকার প্রস্তুত প্রকরণকে ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যানে ব্যবহার করেছেন, তারা কি সত্যিই কপিলকে ভ্রান্ত মনে করেন, যিনি একই সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়কেই স্বীকার করেছেন?

ফলতঃ এই উল্লেখসমূহে বাস্তবিকতা এই যে, সাংখ্যে ঈশ্বরের অধিষ্টাতৃত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে, তথা জগতের প্রতি তাঁর উপাদানতার প্রতিষেধ করা হয়েছে। প্রস্তুত প্রকরণে এই অর্থটিই প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপাদিত হয়েছে।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর